ভারতের কবি

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষার্থীদের
বাঙ্গালা দ্রুতপঠনের জন্য নির্ব্বাচিত]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., পি-এইচ. ডি
প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার

ও

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., পি-এইচ. ডি
প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার
প্রণীত

এ. মুখার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ : : ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

সূচীপত্র

মূল্য এক টাকা আট আনা : তৃতীয় সংস্করণ

কলিকাতা, ২, কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং ২৮নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, অভয়া প্রেস হইতে শ্রীধর্ম্মদাস ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

কালিদাস

কালিদাস প্রাচীন ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কাব। সংস্কৃত ভাষায় তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক, সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। সৌন্দর্য্য বর্ণনায় তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। তাঁহার সৌন্দর্য্যানুভূতি কত প্রখর এবং সূক্ষ্ম, তাঁহার সৌন্দর্য্যসৃষ্টির ক্ষমতা কিরূপ অসাধারণ, তাহা তাঁহার কাব্যরস আস্বাদন করিলেই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। প্রকৃতির সহিত মানব-হৃদয়ের গভীর সংযোগের ফলে যে অপূর্ব্ব রসের সৃষ্টি হয় তাহার সমুজ্জ্বল উদাহরণ কালিদাসের অনুপম নাটক ও কাব্যগুলি। আমরা যেখানে সৌন্দর্য্যের আভাসমাত্রও পাই না, কালিদাস সেখানেও সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়াছেন ; অদ্ভুত বর্ণনার চাতুর্য্যে বর্ণহীন বস্তুও তাঁহার কল্পনার রঙে নব নব রূপে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। এমনি করিয়া নিখিল বিশ্বের সকল বস্তুকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়া দেখিতে আর কোন কবি পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় কালিদাসের গ্রন্থাবলীর অনুবাদ হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, কিন্তু তিনি কোন্ সময়ে ভারতের কোন্ অংশে আ।বর্ভূত হইয়াছিলেন তাহা

আমরা আজও নিশ্চিতরূপে জানি না। ঐতিহাসিকগণ বহু তর্কবিতর্ক করিয়াও এসম্বন্ধে কোন সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল,
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল।"

আজকাল অনেক ঐতিহাসিক এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে কালিদাস খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন এবং গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার পুত্র প্রথম কুমারগুপ্তের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে 'কুমারসম্ভব' কাব্যখানি কুমারগুপ্তের জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত হইয়াছিল। কিংবদন্তী আছে যে কালিদাস উজ্জয়িনীর অধিপতি বিক্রমাদিত্যের সভা-কবি এবং নবরত্নের অন্যতম রত্ন ছিলেন। বিক্রমাদিত্য কোন রাজার নাম নহে, ইহা একটি উপাধিমাত্র। প্রাচীন ভারতের একাধিক রাজা এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত ছিলেন। পাটলিপুত্র এবং উজ্জয়িনী দুই-ই তাঁহার রাজধানী ছিল। কোন কোন শিলালিপিতে তাঁহাকে "পাটলিপুরবরাধীশ্বর" এবং "উজ্জয়িনীপুরবরাধীশ্বর" রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কালিদাস নিজের কোন গ্রন্থে নিজের বা বিক্রমাদিত্যের পরিচয় লিখিয়া যান নাই, 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' প্রমুখ নাটক তিনখানিতে "কালি-দাস-গ্রথিতবস্তুনা" বলিয়া নিজের নামটি শুধু উল্লেখ করিয়া

গিয়াছেন। যাঁহার কাব্যরস আস্বাদন করিয়া ইউরোপের পণ্ডিতমণ্ডলী মুগ্ধ, ভারতবর্ষে যাঁহার নাম গৃহে গৃহে সমাদৃত, তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনী সম্বন্ধে কিছুই জানিতে না পারা যে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্যমুগ্ধ অন্তর্জ্জগতের পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাঁহার কাব্য হইতে। তাহা হইতে স্পষ্টই ধারণা হয় যে কালিদাসের মত বিশুদ্ধ বিচারবুদ্ধি, উদার রসদৃষ্টি ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা লইয়া অতি অল্পসংখ্যক কবিই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

কালিদাস সম্বন্ধে আমাদের দেশে অনেক কাহিনী বহুদিন ধরিয়া প্রচলিত আছে। সেগুলি কাহিনী মাত্র—প্রকৃত সত্য তাহার মধ্যে আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। তিনি নাকি ঘোর মূর্খ ছিলেন। একদিন তিনি বৃক্ষের যে শাখায় বসিয়াছিলেন সেই শাখাই কাটিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে মহা মূর্খ বলিয়া স্থির করিলেন এবং কৌশলে এক উদ্ধতা প্রগল্‌ভা রাজকুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। পরে স্বামীর মূর্খতার পরিচয় পাইয়া রাজকন্যা একদিন তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। কালিদাস ভগ্নহৃদয়ে সংসার ত্যাগ করিলেন এবং কঠোর তপস্যার ফলে সরস্বতীর কৃপা ও বর লাভ করিয়া অসামান্য কবি-শক্তির অধিকারী হইলেন। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধেও এইরূপ বিচিত্র কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

কালিদাসের কাব্য রচনা সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। একদা তাঁহার পত্নী রাগ করিয়া রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসিয়াছিলেন।

কবি আসিয়া রুদ্ধ দ্বারে আঘাত হানিয়া কহিলেন, "দ্বার খোল, তোমার সঙ্গে একটি বিশেষ কথা আছে" ("অস্তি কশ্চিদ্বাগ্ বিশেষঃ")। কবি-গৃহিণী প্রথমটা কিছুতেই দ্বার খুলিবেন না, অবশেষে এই সর্ত্তে রাজী হইলেন যে—"অস্তি কশ্চিদ্বাগ্" কালিদাস এই বাক্যের প্রতিটি শব্দ দ্বারা আরব্ধ তিন খানি পৃথক্ পৃথক্ কাব্য রচনা করিয়া দিবেন। 'কুমারসম্ভব,' 'মেঘদূত,' 'রঘুবংশ'—এই তিনটি কাব্যের প্রথম শব্দ যথাক্রমে 'অস্তি,' 'কশ্চিৎ,' 'বাক্'। 'কুমারসম্ভবে'র সূত্রপাত—"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা"। 'মেঘদূতে'র আরম্ভ—"কশ্চিৎকান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ"। 'রঘুবংশে'র আরম্ভ—"বাগর্থাবিব সংপৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে"।

কালিদাসের নামে প্রচলিত কোন কোন গ্রন্থ কালিদাসের রচিত কিনা এবিষয়ে মতবিরোধ আছে। কালিদাসের গ্রন্থাবলী বলিয়া প্রকাশিত গ্রন্থে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কয়েকখানি ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—'ঋতুসংহার,' 'নলোদয়,' 'পুষ্পবাণবিলাস,' 'শ্রুতবোধ,' 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা,' 'শৃঙ্গাররসাষ্টক' প্রভৃতি। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কোন কোনটির রচনার অপকর্ষ লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিতগণ এই গুলিকে অন্যের রচনা বলিয়া মনে করেন। কোন্ কোন্ কাব্য তাঁহার রচিত এবং কোন্‌গুলি তাঁহার রচিত নহে, এই সমস্যা এখনও চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হয় নাই।

'ঋতুসংহার' ছয়টি সর্গে বিভক্ত। ইহাতে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ,

হেমন্ত, শিশির, বসন্ত—এই ছয় ঋতুর সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। 'নলোদয়' কাব্যে সর্গ মাত্র চারটি। ইহাতে নল-দময়ন্তীর প্রসিদ্ধ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ইহা একটি খণ্ডকাব্য। 'রঘু'-'কুমার'-প্রণেতা কালিদাস 'নলোদয়' রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। 'নলোদয়' কাব্যে কেবল শব্দালঙ্কারেরই অদ্ভুত কলাকৌশল দেখানো হইয়াছে। কালিদাসের কাব্যের রীতিধর্ম্ম ইহা নয়। 'শ্রুতবোধ' অতি সুপরিচিত ছন্দোগ্রন্থ। ইহার শ্লোকসংখ্যা মাত্র ৪১টি। ছন্দের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত একই শ্লোকের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা' গদ্য-পদ্যময় উপাখ্যান। বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর তাঁহার সিংহাসনে বসিবার যোগ্য লোক না থাকায় আকাশ-বাণী শুনিয়া মন্ত্রিগণ সিংহাসনখানা কোন পবিত্র ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিলেন। কালক্রমে ইহা ভূগর্ভে নিহিত হইয়া গেল। বহু বৎসর অতীত হইলে মালবরাজ্যের অধিপতি ভোজরাজ ইহার উদ্ধার সাধন করেন। ভোজরাজ সেই সিংহাসনে আরোহণ করিতে গেলে সিংহাসনের পুত্তলিকাকৃতি ৩২টি সোপান বিক্রমাদিত্যের গুণাবলীর বিবরণ দিয়া ৩২টি উপাখ্যান বলিল। ইহাই 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা' গ্রন্থের বিষয়বস্তু। 'পুষ্পবাণবিলাস' অতি ক্ষুদ্র কাব্য; ইহার শ্লোকসংখ্যা মাত্র ২৬। 'শৃঙ্গার-তিলক'-ও অনুরূপ ক্ষুদ্র কাব্য—শ্লোকসংখ্যা ২৬। 'শৃঙ্গার-রসাষ্টক' মাত্র আটটি শ্লোকের সমষ্টি। এই তিনখানা কাব্যের রচনা ও রুচি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। যে মহাকবির সৃষ্ট অনবদ্য সৌন্দর্য্য

যুগ যুগ ধরিয়া রসিকমণ্ডলীকে আনন্দ দান করিয়াছে—এই নিকৃষ্ট কাব্যগুলি তাঁহার লেখনীপ্রসূত বলিয়া স্বীকার করা কঠিন।

'কুমারসম্ভব' এবং 'রঘুবংশ'—এই দুইখানি কালিদাসের অমর মহাকাব্য ; 'মেঘদূত' তাঁহার জগদ্‌বিখ্যাত খণ্ডকাব্য এবং 'মালবিকাগ্নিমিত্র,' 'বিক্রমোর্ব্বশী,' 'অভিজ্ঞানশকুন্তল'—এই তিনখানি তাঁহার মহামূল্য নাটক। এই গ্রন্থগুলির রচয়িতা যে কালিদাস—সে সম্বন্ধে কোনও মতদ্বৈধের কারণ নাই। কেবল 'কুমারসম্ভবে'র সপ্তদশ সর্গের মধ্যে প্রথম সাতটি সর্গই কালিদাসের লেখনীপ্রসূত, অবশিষ্ট সর্গগুলি প্রক্ষিপ্ত—কবিযশঃপ্রার্থী কোন সাধারণ কবি কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া সন্দেহ হয়। এই সর্গগুলিতে লিপিচাতুর্য্যের যে দীনতা, প্রকাশভঙ্গীর যে দুর্ব্বলতা এবং বিষয়বস্তুর যে অপ্রাসঙ্গিকতা দেখা যায় তাহা কালিদাসের লেখনীর উপযুক্ত নহে। কালিদাস সপ্তম সর্গ পর্য্যন্ত লিখিয়াই গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছিলেন, অথবা তাঁহার রচিত অবশিষ্ট সর্গগুলি বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়াছে—এ বিষয়ে মতের অনৈক্য আছে বটে, কিন্তু 'কুমারসম্ভবে'র শেষ কয়েকটি সর্গের রচয়িতা যে কালিদাস নহেন সে বিষয়ে প্রায় সকল কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তিই একমত।

'কুমারসম্ভব' খুব সম্ভবতঃ 'রঘুবংশে'র পূর্ব্বে বিরচিত ; রচনা-প্রণালী, ঘটনাবিন্যাস প্রভৃতি তাহার সাক্ষ্য। 'কুমারে'র সুন্দর সৃষ্টি 'রঘুবংশে' সুন্দরতর হইয়াছে ; 'কুমারে'র

রচনাভঙ্গীর মধ্যে স্থানে স্থানে যে শিথিলতা দেখিতে পাওয়া যায় 'রঘুবংশে' তাহা অপসৃত হইয়াছে, রচনা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। রতি বিলাপ ও অজ বিলাপ, পার্ব্বতীর বিবাহ ও ইন্দুমতীর বিবাহ প্রভৃতি প্রসঙ্গের তুলনামূলক বিচার করিলেই ইহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। 'কুমারসম্ভবে' কবি নবীন কল্পনার উল্লাসে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল খুঁজিয়া সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়াছেন—স্বর্গের দেবদম্পতির মধ্য দিয়া কাব্য-লক্ষ্মীর বন্দনা গান গাহিয়াছেন; কিন্তু পরে সৌন্দর্য্যের জন্য আর কবিকে পৃথিবীর বাহিরে যাইতে হয় নাই, কাব্যশ্রী ভারতবর্ষের নৃপতিবর্গের দেবদুর্ল্লভ চরিত্রের মধ্য দিয়া উজ্জ্বলতর মহিমায় প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। 'রঘুবংশ' ভারতবর্ষের একটি বিখ্যাত রাজবংশের কাহিনী—কোন দেবতার মহিমা ইহাতে নাই। কালিদাসের নাটকাবলীর মধ্যেও প্রতিভার এইরূপ ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতি দেখা যায়। প্রথমে 'বিক্রমোর্ব্বশী'—তাহাতে মর্ত্ত্য ও মর্ত্ত্যের অতীত লোকের বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে। পরে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' ও 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল'; ইহাতে মর্ত্ত্যের বিষয়ই নিপুণভাবে বর্ণিত ও চিত্রিত হইয়াছে। 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র নায়ক অগ্নিমিত্র ততখানি আদর্শ চরিত্র নহেন, কিন্তু কবির সর্ব্বশেষ গ্রন্থ 'অভিজ্ঞানশকুন্তলে' দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার চরিত্র অনিন্দ্য ও উজ্জ্বল। এই অপূর্ব্ব নাট্যকাব্য চরিত্রসৃষ্টি, বর্ণনারীতি প্রভৃতি অনেক বিষয়েই 'বিক্রমোর্ব্বশী' অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর

কবি-শক্তির নিদর্শন। কালিদাস 'অভিজ্ঞানশকুন্তলে' যেরূপ নিপুণতার সহিত চরিত্রসৃষ্টি করিয়াছেন জগতের সাহিত্যে তাহার তুলনা বিরল।

'কুমারসম্ভবে'র মূল কাহিনীটি এই ঃ—তারক নামে এক মহাবল অসুর ব্রহ্মার বরে অসামান্য শক্তি লাভ করিয়া দেবতাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করে এবং তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। দেবতারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। ব্রহ্মা দেবতাদিগকে বলিলেন যে পার্ব্বতীর গর্ভে শিবের যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন তিনি দেবতাদের সেনাপতি হইয়া তারকাসুরের প্রাণসংহার করিয়া দেবতাদিগকে পুনরায় স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ইহা শুনিয়া দেবতারা উদ্যোগী হইয়া গৌরীর প্রণয় সম্পাদনের নিমিত্ত কন্দর্পকে নিযুক্ত করেন। কন্দর্প সমাধিস্থ শিবের ধ্যানভঙ্গ করিতে উদ্যত হইলে ক্রুদ্ধ ধূর্জ্জটির তৃতীয় নয়ন হইতে নির্গত অগ্নিশিখা তাঁহাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। পরে নারদাদির প্রচেষ্টায় হর-গৌরীর পরিণয় হয় এবং কার্ত্তিকেয় জন্মগ্রহণ করেন। তারপর বয়ঃপ্রাপ্ত কুমার দেবতাদের সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়া তারকাসুরকে বধ করেন এবং দেবতাদিগকে স্বর্গাধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

মোটামুটি এই ঘটনাটি রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত আছে। কিন্তু শুধু বিষয়টি জানিলেই কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' জানা হয় না। কল্পনা-মাধুর্য্যে ও ভাষার

লালিত্যে এই বহুপরিচিত উপাখ্যানটি কালিদাসের হাতে নূতন রূপে, রসে ও কবিত্ব-সম্পদে একেবারে অভিনব হইয়া উঠিয়াছে। কালিদাস এমন ভাবে ঘটনার সংস্থান, বিন্যাস ও ভাবদ্বন্দ্বের সমাবেশ করিয়াছেন যে শ্লোক, অনুবন্ধ, অধ্যায়গুলি স্বতন্ত্র অথচ সূত্রবদ্ধ চিত্রপরম্পরার মত চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে, চরিত্রগুলি আপন মহিমায় ও স্বাতন্ত্র্যে সজীব হইয়া দেখা দেয়।

হিমালয়ের বর্ণনা দিয়া কালিদাস 'কুমারসম্ভব' আরম্ভ করিয়াছেন। বিরাটদেহ, বিচিত্রশ্রী, অনন্তরত্নপ্রভব হিমালয় ভারতবর্ষের পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যে দণ্ডায়মান। হিমালয়কে 'নগাধিরাজ' রূপে ব্যক্তিত্ব দান করা হইয়াছে। এই গিরিরাজের কন্যা রূপে গৌরী জন্মগ্রহণ করিলেন। শশিকলা যেমন শুক্লপক্ষে ক্রমবর্দ্ধমানা হইয়া পূর্ণিমার চন্দ্রে পূর্ণতা লাভ করে, তেমনি ধীরে ধীরে উমা যৌবন প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময়ে শঙ্কর হিমালয়ের সানুদেশে মহাতপস্যায় মগ্ন ছিলেন। উমা নিজের সখীদের সহিত গিয়া প্রতিদিন ভগবান মহাদেবকে অর্চ্চনা করিয়া আসিতেন। এমন ভাবে দিন যাইতে লাগিল। ওদিকে স্বর্গে তারকাসুর কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া দেবগণ ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে উমা-মহেশ্বরের পুত্র কার্ত্তিকেয় তারকাসুরকে নিধন করিবেন। দেবরাজ ইন্দ্র তখন কৌশলে শিবের ধ্যানভঙ্গ করিয়া এই পরিণয় সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিলেন এবং কন্দর্পকে এই

সুকঠিন কার্য্যে পাঠাইয়া দিলেন। শিবের ধ্যানভঙ্গের এই দৃশ্যটি শুধু 'কুমারসম্ভবে'. নহে—সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের সুবিপুল ভাণ্ডারে একটি সমুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ।

মদন, রতি ও বসন্ত—তিনজন মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে আসিয়াছে। বহির্জ্জগতে বিচিত্র সৌন্দর্য্যের আবেষ্টনী সৃষ্টির ভার বসন্তের, আর অন্তর্জ্জগতে ইন্দ্রিয়বিক্ষোভ সৃষ্টি করিবার ভার মদন ও রতির। নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় যোগ-মগ্ন ধূর্জ্জটি বসিয়াছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার ধ্যানের আবেশ অপসৃত হইল; এদিকে বিচিত্র পুষ্পাভরণে অবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মত উমা মহেশ্বরকে অর্চ্চনা করিতে আসিলেন। এই মুহূর্ত্তে মদন সম্মোহন নামে বাণ নিক্ষেপ করিল। অকস্মাৎ উমা কাঁপিয়া উঠিলেন—মহাযোগী সংযমিশ্রেষ্ঠ শিবের চিত্তেও বিকার উপস্থিত হইল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে শিব চারিদিকে একবার চাহিলেন এবং ধনুর্ব্বাণ হস্তে কন্দর্পকে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার তৃতীয় নয়নের অগ্নি মদনকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল।

মদনভস্ম হইল বটে, কিন্তু পার্ব্বতীর হৃদয় শান্ত হইল না। বিরূপাক্ষ মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার দুর্জ্জয় বাসনায় উমা আপনার বাড়ী-ঘর, পিতামাতা সকলই ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বনে গিয়া দুশ্চর তপস্যা করিতে লাগিলেন। নিদারুণ গ্রীষ্মকালে নিজের চতুর্দ্দিকে অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া সূর্য্যের দিকে অপলক

চোখে উমা চাহিয়া থাকিতেন ; প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে অনাবৃত শিলাতলে শয়ন করিয়া তাঁহার রাত্রি কাটিত।

এইভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল। অবশেষে আশুতোষ সন্তুষ্ট হইলেন। তথাপি তিনি একবার নবীন ব্রহ্মচারীর বেশে আসিয়া উমার শিবভক্তির পরীক্ষা লইলেন। উমাকে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া অবশেষে ছদ্মবেশী ব্রহ্মচারী শিবের নিন্দা আরম্ভ করিলেন। পার্ব্বতী শিবনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া তীব্র ভাবে উত্তর দান করিলেন। 'মহাপুরুষের যে নিন্দা করে কেবল সে নয়, যে তাহা শোনে সেও মহাপাপী'—এই বলিয়া উমা স্থান ত্যাগ করিবার জন্য পা বাড়াইলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ছদ্মবেশ খুলিয়া গেল,—নিজমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া শিব প্রস্থানোদ্যতা গৌরীকে ধরিয়া ফেলিলেন। আর গৌরীর অবস্থা কি হইল ? পথিমধ্যে পর্ব্বত কর্ত্তৃক রুদ্ধগতি নদী যেমন আকুলিত হয় তেমনি "শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ"—হিমালয়-দুহিতা যাইতেও পারেন না, দাঁড়াইতেও পারেন না। তারপর হিমালয়-সদনে হর-গৌরীর বিবাহ যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গেল। দেবতারা আসিয়া শিবকে সন্তুষ্ট করিয়া কন্দর্পের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন ; প্রসন্নচিত্ত আশুতোষের কৃপায় কামদেবতা পুনর্জ্জীবন লাভ করিল। যথাকালে তারকারি কুমারের জন্মের সূচনা হইল।

কালিদাস সম্ভবতঃ শৈব ছিলেন। 'রঘুবংশে'র প্রারম্ভে তিনি বলিয়াছেন, "জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ"

—জগতের পিতামাতা পর্ব্বতী ও পরমেশ্বরকে বন্দনা করি। তিনখানি নাটকের নান্দীতে তিনি ইষ্ট দেবতা আশুতোষকেই বিভিন্ন চিত্রে বিভিন্ন ভাষায় বন্দনা করিয়াছেন। সেই শ্লোক-রাজিকে প্রথাগত দেবস্তুতি বলিয়া মনে হয় না—পবিত্র গম্ভীর মন্ত্রে তাহা উচ্চারিত, উপনিষদের ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনার স্নিগ্ধ বজ্রগম্ভীর ঘোষ যেন এইগুলির মধ্যে ধ্বনিত হইতেছে। সেই অভীষ্ট দেবতার সৌম্যমূর্ত্তি বর্ণনা করিয়া কালিদাস 'কুমারসম্ভব' কাব্যের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। নাটকগুলির ভরতবাক্যেও তিনি শিবের আশীর্ব্বাদই কামনা করিয়াছেন।

"সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে, তন্মধ্যে কালিদাস প্রণীত রঘুবংশ সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট·········রঘুবংশে সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। এই মহা-কাব্য উনবিংশতি সর্গে বিভক্ত। প্রথম আট সর্গে দিলীপ, রঘু, অজ এই তিন রাজার বর্ণনা আছে। নবম অবধি পঞ্চদশ পর্য্যন্ত সপ্ত সর্গে দশরথের ও দশরথতনয় রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। অবশিষ্ট চারি সর্গে কুশ অবধি অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত রামের উত্তরাধিকারীদিগের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত আছে।"

সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই কবির প্রথম ও প্রধান গুণ, সন্দেহ নাই। সেই সৃষ্টিনৈপুণ্যের কোন প্রকার লঘুতা ঘটিলে কাব্যের অপকর্ষ ঘটে। আবার লোকশিক্ষা, সমাজশিক্ষা, আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি প্রভৃতিও কাব্যের অন্যান্য প্রধান গুণ। কল্পনার উদ্দাম গতিকে কাব্যের একমাত্র প্রাণ-শক্তি বলিয়া বিবেচনা করা

হয় না।° কালিদাসের 'রঘুবংশে' এই সত্য বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করা যায়। ধনমান ও সামরিক শক্তির তুলনায় তপ, জ্ঞান ও ত্যাগধর্ম্মের প্রাধান্য; গুরুবাক্যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা; অপরিসীম পতিভক্তি ও পত্নীপ্রেম; আশ্রিত একটি গাভী সংরক্ষণে তরুণ নৃপতির জীবনদানের সঙ্কল্প; ভিক্ষার্থী অতিথির জন্য দিগ্বিজয়ী রাজার যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন—এই সকল উচ্চাদর্শমূলক কাহিনী এই কাব্যে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

সূর্য্যবংশীয় মহারাজ দিলীপ সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি, কিন্তু তিনি নিঃসন্তান। তাই তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র শান্তি নাই। একদা ধর্ম্মপত্নী সুদক্ষিণাকে সঙ্গে করিয়া তিনি কুলগুরু বশিষ্ঠদেবের আশ্রমে গেলেন এবং নিজের মনোবেদনার কথা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। ধ্যানযোগে বশিষ্ঠ ইহার কারণ জানিয়া রাজা ও রাণীকে সুরধেনু সুরভির কন্যা নন্দিনী নামে গাভীটির সেবা করিতে আদেশ করিলেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া রাজা নন্দিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনে বনান্তরে ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যাকালে তাহার সহিত ফিরিয়া আসেন। রাণী উপবাসে থাকিয়া নন্দিনীর আরতি ও অর্চ্চনা করেন। এইভাবে দিন যাইতে লাগিল। একদিন বনের মধ্যে একটি সিংহ নন্দিনীকে আক্রমণ করায় রাজা তূণীর হইতে তীর তুলিতে গিয়াও ব্যর্থকাম হইলেন। হাত তাঁহার অবশ হইয়া গেল। তখন সেই সিংহের সঙ্গে মানুষের ভাষায় রাজার সঙ্গে বহু বাক্যালাপ হইল—রাজা নিজের জীবনের বিনিময়ে তাঁহার

আশ্রিতা ও সংরক্ষিতা গাভীটির জীবন ভিক্ষা চাহিলেন। ইহা একটি পরীক্ষা মাত্র—নন্দিনীর মায়াতেই ইহা ঘটিয়াছিল। কাজেই সন্তুষ্ট হইয়া নন্দিনী রাজ-দম্পতিকে বর দিতে চাহিলেন। রাজা দিলীপ কুলরক্ষক অনন্তকীর্ত্তি সন্তান প্রার্থনা করিলেন। এই সন্তানই হইলেন রঘু। কালক্রমে রঘু যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। পিতার যজ্ঞাশ্ব রক্ষাকল্পে রঘু দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করেন। তাঁহার বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র যজ্ঞাশ্বটি রঘুকে প্রত্যর্পণ করেন। তারপর যথাকালে রঘুকে সিংহাসনে বসাইয়া মহারাজ দিলীপ বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন।

সিংহাসন বিলাসের বস্তু নহে,—রাজধর্ম্মাচরণের যোগাসন। সুতরাং প্রজাবৃন্দের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রঘু আত্মনিয়োগ করিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই প্রজাদের পিতা ছিলেন, তাহাদের জন্মদাতা পিতা কেবল নামে মাত্র পিতা—"স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ।" রঘুর সুশাসনে সকলেই শান্তিতে বাস করিত।

রাজধর্ম্ম অনুসারে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ মহারাজ রঘু দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন এবং নানা দেশ জয় করিয়া বিপুল ধন-রত্ন ও বিজিত রাজন্যবর্গের সহিত অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। এই দিগ্বিজয় বর্ণনা করিতে গিয়া কালিদাস শুধু যে প্রাচীন ভারতবর্ষের একখানা মানচিত্র আঁকিয়াছেন তাহাই নহে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নদ-নদী-পর্ব্বতের বর্ণনা, জনগণের

জীবনযাত্রা, রীতিনীতি ও সমৃদ্ধির মনোরম আলেখ্য প্রদান করিয়াছেন। দিগ্বিজয়ী রঘু বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন।

কালক্রমে রাজর্ষি রঘু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্ররত্ন লাভ করিলেন। পুত্রের নাম হইল অজ। অজ পিতার ন্যায় ওজস্বী, বীর্য্যবান, সমুন্নতকলেবর। বিদর্ভ-রাজকুমারী ইন্দুমতী স্বয়ংবরা হইবেন। কুমার অজ সসৈন্যে বিদর্ভ যাত্রা করিলেন। কালিদাস বিশদভাবে অতি নৈপুণ্যের সহিত ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভার বর্ণনা করিয়াছেন। সমাগত রাজন্যবর্গের বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নৃপতিবর্গের সামরিক শক্তি, ঐশ্বর্য্য, আদর্শ রাজ-ধর্ম্ম পালন প্রভৃতির আলোচনা করা হইয়াছে। স্বয়ংবর সভায় অন্য রাজন্যবর্গকে উপেক্ষা করিয়া ইন্দুমতী অজকেই পতিত্বে বরণ করিলেন। তারপর যথাকালে রঘু পুত্রের হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলে অজ আদর্শ রাজধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলন।

কিন্তু দীর্ঘকাল কেহ অবিমিশ্র সুখ সম্ভোগ করে না, অজেরও ভাগ্যে অন্যথা হইল না। অজ ইন্দুমতীর সহিত রথারোহণে বিহার করিতেছিলেন; দৈবযোগে দেবর্ষি নারদের বীণা-স্খলিত পুষ্পমাল্য ইন্দুমতীর দেহে পতিত হইল। ইহাতেই রাণীর প্রাণবিয়োগ ঘটিল। বিনামেঘে বজ্রপাত হইল। অজ করুণ কণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অজের বিলাপ শুধু

সংস্কৃত সাহিত্যের নয়, বিশ্বের করুণ-রস-সাহিত্যের একটি অমর অধ্যায়। ইন্দুমতী তাঁহার কি না ছিলেন!—"গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ"—গৃহিণী, মন্ত্রণাদায়িনী, নিভৃত জীবনে সখী, ললিত কলা বিদ্যায় প্রিয় শিষ্যা। এমন পত্নী হারাইয়া অজ আর জীবনধারণ করিতে পারিলেন না, যুবরাজ দশরথের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া গঙ্গা এবং সরযূর পবিত্র সঙ্গমে প্রায়োপবেশনে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলেন।

দশরথ মগধ, কেকয় ও কোশল রাজ্যের রাজকন্যাত্রয়ের পাণিগ্রহণ করিয়া অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত রাজ্য পরিচালনা করিতেছিলেন। একদা মৃগয়া করিতে গিয়া ভ্রমক্রমে তিনি এক মুনিকুমারকে বধ করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে মুনি এই বলিয়া দশরথকে অভিশাপ দেন যে দশরথও তাঁহার মত পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন। দশরথ অপুত্রক ছিলেন; কাজেই এই অভিশাপকে তিনি আশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। দিন যাইতে লাগিল। ওদিকে স্বর্গে দেবতারা রাবণবধের উপায় স্থির করিবার জন্য বিষ্ণুর সকাশে উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বিদায় করিয়া চারি অংশে দশরথের তিন পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন।

রাম-চরিত্র লইয়াই রামায়ণ। কবিগুরু বাল্মীকি তাঁহার অমর মহাগ্রন্থে যেমন নিপুণতার সহিত বিশদভাবে রাম-চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই, কিন্তু কালিদাস মাত্র পাঁচটি সর্গে রাম ও সীতার লোকোত্তর চরিত্র অতি সংক্ষেপে

এমন উজ্জ্বল ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন যে তাহার মাধুর্য্যেও আমরা মুগ্ধ হইয়া যাই। রাম-চরিত্রের প্রধান ঘটনাগুলি যথাযথ বর্ণনা করিয়াও তিনি বাল্মীকির কথা ও ভঙ্গীর পুনরাবৃত্তি করেন নাই। তিনি আপন মনের মাধুরী দিয়া রামসীতার চরিত্র এবং অযোধ্যা-দণ্ডকারণ্য-লঙ্কার চিত্র এমন ভাবে অঙ্কন করিয়াছেন যে তাহা এক অভিনব মাধুর্য্যে রস-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

রাম ইহলোক পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কুশাবতী নগরে কুশকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। অযোধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী নিশীথ স্বপ্নে কুশের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিজের দুঃখের কথা বলিলেন এবং তাঁহাকে পিতৃ-পুরুষের রাজধানী অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কুশাবতী ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া কুশ সদলবলে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহারাজ কুশ শৌর্য্য-বীর্য্যে অপরাজেয় হইয়াও দুর্জ্জয় নামক এক দানবের সহিত যুদ্ধে দানবকে বধ করিয়া স্বয়ং নিহত হইলেন। কুমার অতিথি রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। রাজা অতিথির পর ক্রমান্বয়ে বাইশ জন রঘুবংশধর পরপর অযোধ্যার সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। শেষ রাজা অগ্নিবর্ণ কোন বংশধরকে সিংহাসনে বসাইয়া যাইতে পারেন নাই। আসন্নপ্রসবা মহিষীকে অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। যে সাহস, শক্তি, গাম্ভীর্য্য, ক্ষমা, বিনয় প্রভৃতি গুণে রঘুবংশীয় পুণ্যশ্লোক নৃপতিবৃন্দ ভূষিত

ছিলেন—মদ্যপায়ী, চরিত্রহীন, দুর্ব্বল অগ্নিবর্ণে তাহার লেশমাত্র ছিল না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজবংশের সর্ব্বাপেক্ষা অযোগ্য বংশধর অগ্নিবর্ণের চরিত্র আলোচনা করিতে কালিদাস একটি গোটা সর্গ উৎসর্গ করিয়া 'রঘুবংশ' সমাপ্ত করিয়াছেন।

কালিদাসের খণ্ডকাব্যগুলির মধ্যে 'মেঘদূত' বিশেষ সুপরিচিত। "সংস্কৃত ভাষায় যত খণ্ডকাব্য আছে, মেঘদূত তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মেঘদূত ক্ষুদ্র কাব্য বটে, কিন্তু ইহার প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্ব-শক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।"

কুবেরের ভৃত্য এক যক্ষ অত্যন্ত স্ত্রৈণতাবশতঃ কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করায় কুবের তাহাকে এই শাপ দেন যে তাহাকে একাকী এক বৎসর রামগিরিতে অবস্থান করিতে হইবে। আটমাস নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করিয়া প্রিয়তমার বিরহে যক্ষ অধীর হইয়া উঠে। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে নভোমণ্ডলে নূতন মেঘের উদয় দেখিয়া তাহার চিত্তবিকার ঘটিল। তাহার মনে হইল যেন মেঘ সচেতন প্রাণী ; তাই সে প্রিয়ার নিকট সংবাদ পাঠাইবার উদ্দেশ্যে মেঘকে দৌত্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। হয়ত যক্ষপুরীর পথ মেঘ চিনিতে পারিবে না, তাই সে রামগিরি হইতে অলকা পর্য্যন্ত পথের বর্ণনা করিল। ইহাই 'মেঘদূতে'র বিষয়বস্তু। এই বর্ণনা প্রসঙ্গে কালিদাস প্রাচীন ভারতের এক অপূর্ব্ব ভৌগোলিক চিত্র আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। কত গিরি, নদী, গ্রাম, নগর, উপবন, দেবালয়,

রাজধানী—হিমালয়, কৈলাস, অলকা—একটির পর একটি চিত্র যেন প্রত্যক্ষবৎ আমাদের মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠে। তাহার পরে বিরহিণী যক্ষ-পত্নীর বর্ণনা! "ঐ সমস্ত বর্ণনায় এমন অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও অনন্য-সামান্য সহৃদয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে যে যদি কালিদাস মেঘদূত ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও কাব্য রচনা না করিতেন, তথাপি তাঁহাকে ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কবি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইত।"

'মেঘদূত' দুই খণ্ডে বিভক্ত—'পূর্ব্ব মেঘ' ও 'উত্তর মেঘ'। 'পূর্ব্ব মেঘে' মেঘকে দৌত্যে বরণ এবং তাহার পথ-নির্দ্দেশ উল্লিখিত হইয়াছে; 'উত্তর মেঘে' অলকাপুরীতে যক্ষের আলয়, যক্ষ-পত্নীর সৌন্দর্য্য প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যের প্রত্যেক শ্লোকই মন্দাক্রান্তা নামক সুমধুর ছন্দে গ্রথিত। ভাষা ও ভাবের উৎকর্ষে প্রত্যেক শ্লোকই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। কালিদাসের অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন সংস্কৃত কবি 'হংসদূত', 'পদাঙ্কদূত', 'পবনদূত' প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়াছেন, অনেক বাঙ্গালী কবি বাঙ্গালা কবিতায় 'মেঘদূতে'র অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু কালিদাসের কবিতার ঐশ্বর্য্য ও কবিত্বের মাধুর্য্য কে অনুকরণে বা অনুবাদে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে?

এইবার কালিদাসের নাটকাবলীর আলোচনা করা যাউক। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' পার্থিব বিষয়বস্তু লইয়া রচিত। 'বিক্রমোর্ব্বশী'তে পর্থিব ও অপার্থিব বিষয়বস্তুর সহিত কবি-কল্পনার অপূর্ব্ব সম্মিলন। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' একখানি ঐতিহাসিক নাটক।

অগ্নিমিত্র একজন ঐতিহাসিক নৃপতি। তাঁহার পিতা পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মগধের সম্রাট্ ছিলেন। পিতার জীবৎকালে অগ্নিমিত্র বিদিশা নগরীতে বাস করিয়া রাজপ্রতিনিধি রূপে মধ্যভারত শাসন করিতেন। তাঁহার সহিত বিদর্ভ-রাজকুমারী মালবিকার প্রেমের কাহিনী অবলম্বন করিয়া কালিদাস এই নাটকখানি রচনা করিয়াছেন। ঘটনাচক্রে মালবিকা দস্যু কর্তৃক অপহৃতা হন এবং নানারূপ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর অগ্নিমিত্রের প্রধানা মহিষী ধারিণীর আশ্রয় লাভ করেন। একদিন অকস্মাৎ অগ্নিমিত্র চিত্রে মালবিকার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হন। পরে রাজবয়স্য বিদূষকের কৌশলে মালবিকার সহিত তাঁহার মিলন হয়। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া ধারিণী ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মালবিকাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বিদূষক আবার নানা কৌশলে রাজার সহিত তাঁহাকে সম্মিলিত করিলেন। পরে রাণী ধারিণীর ক্রোধের উপশম হইল ; তিনি স্বয়ং উদ্যোগিনী হইয়া অগ্নিমিত্রের সহিত মালবিকার বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন। বিবাহসভায় মালবিকার বংশপরিচয় দৈবক্রমে প্রকাশিত হইল। তখন বিদিশার রাজ-অন্তঃপুরে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল।

মালবিকা রাজার কন্যা, কিন্তু ভাগ্যবশে রাজবধূ না হইয়া তিনি অগ্নিমিত্রের প্রধানা মহিষীর পরিচারিকা হইয়াছিলেন। তবু কোন সময়ে, কোন অবস্থায় তিনি কোন প্রকার অধীরতার পরিচয় দেন নাই। কবি মালবিকা-চরিত্র অতি মনোজ্ঞ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। মালবিকার ভাগ্যবিপর্য্যয়

মহাকবির কল্পনার সৃষ্টি। অগ্নিমিত্রকে তিনি প্রতিভাবান নৃপতি-রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যসাধিকা শক্তি ও চিত্তের দৃঢ়তা অপরিসীম। তাঁহার অন্তঃকরণ স্নেহময়, অথচ তিনি কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ। তাঁহার চরিত্র হইতে আমরা সেই যুগের আদর্শ নৃপতির রাজ্যশাসন সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারি। স্নেহদাক্ষিণ্যময়ী ধর্ম্মপরায়ণা প্রবীণা গৃহিণী ধারিণীর চিত্রও অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। চরিত্রসৃষ্টিতে কালিদাস ছিলেন অপরাজেয় শিল্পী।

'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটক পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। ইহাতে পুরূরবা ও উর্ব্বশীর প্রণয়-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহা 'শকুন্তলা'র মত অনবদ্য নহে। ইহা কালিদাসের প্রথম নাটক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে 'মালবিকাগ্নিমিত্র'ই কালিদাসের প্রথম নাটক। যে বৃত্তান্ত অবলম্বনে 'বিক্রমোর্ব্বশী' প্রণীত, বিভিন্ন পুরাণে এবং বেদে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

মহাপরাক্রম নৃপতি পুরূরবা রথে আরোহণ করিয়া আকাশপথে বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন, কেশী নামক অসুর ইন্দ্রসভার প্রধানা নর্ত্তকী উর্ব্বশীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। রাজা কেশীকে নিহত করিয়া সুন্দরীকে উদ্ধার করিলেন। উর্ব্বশী কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মহারাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; তাহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে অনুরাগের সঞ্চার

হইল। তারপর উর্ব্বশী দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু পুরূরবার চিন্তা তাঁহার মন হইতে বিদূরিত হইল না। একদিন অমরাবতীর রঙ্গমঞ্চে লক্ষীর ভূমিকায় অবতীর্ণা উর্ব্বশী পুরূরবার চিন্তায় আত্মহারা হইয়া "পুরুষোত্তমের উপর" এই কথা বলিতে ভুলে "পুরূরবার উপর" এই কথা বলিয়া ফেলিলেন নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা মহর্ষি ভরত তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন, "তুমি মানুষী হও।" উর্ব্বশী মর্ত্ত্যে আসিলেন। রাজা পুরূরবা অমাত্যগণের উপর বিশাল সাম্রাজ্যের ভার অর্পণ করিয়া কৈলাস পর্ব্বতের শিখরে গন্ধমাদন বনে প্রস্থান করিলেন—উর্ব্বশীর মোহে মুগ্ধ হইয়া রাজধর্ম্ম বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু বেশীদিন সুখভোগ তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। দৈবক্রমে উর্ব্বশী এক নিষিদ্ধ অরণ্য প্রবেশ করিয়া লতারূপে রূপান্তরিত হইলেন। দীর্ঘকাল পরে এক মণির স্পর্শে উর্ব্বশীর উদ্ধার হইল। তিনি পুরূরবার সহিত পুনরায় মিলিত হইলেন।

পুরূরবার প্রেমোন্মত্ততা নাটকটিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয় উর্ব্বশীময় হইয়া গিয়াছিল। তিনি রাজধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া উর্ব্বশীর জন্য বনবাস বরণ করিয়াছিলেন। উর্ব্বশীকে হারাইয়া তিনি বিহ্বল হইয়া উন্মত্তবৎ আচরণ করিয়াছিলেন। কবির অবারিত কল্পনা এই শোক-বিহ্বল প্রেমিকের উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তের বর্ণনায় শতমুখী হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

'অভিজ্ঞানশকুন্তল' কালিদাসের সর্ব্বপ্রধান নাটক। সংস্কৃত ভাষার সমস্ত নাটকের মধ্যে ইহা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। মহাভারতের এক ক্ষুদ্র উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কালিদাস এই অপূর্ব্ব নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন।

এই নাটকখানি শুধু ভারতবর্ষে নয়, সুদূর ইউরোপেও অসাধারণ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। জার্ম্মানীর শ্রেষ্ঠ কবি মহামতি গেটে বলিয়াছেন—

Wouldst thou the earth and heaven itself
    In one sole name combine ?
I name thee, O Sakuntala, and
    All at once is said.

—তুমি যদি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের একত্র সম্মিলন দেখিতে চাও তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।

গেটের এই শ্লোকটি দীপবর্ত্তিকার শিখার ন্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা দীপশিখার মতই সমগ্র নাটকখানিকে এক মুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইতেছে।

এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাটকখানি সাত অঙ্কে বিভক্ত। "প্রথম অঙ্কে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার সাক্ষাৎকার, দ্বিতীয়ে রাজার বিদূষকের সহিত শকুন্তলা-বিষয়ক কথোপকথন ও কণ্বাশ্রমবাসী ঋষিগণ কর্ত্তৃক রাজার নিকটে কতিপয় রাত্রি আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার প্রার্থনা, তৃতীয়ে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলন, চতুর্থে শকুন্তলার পতিগৃহে প্রস্থান, পঞ্চমে শকুন্তলার দুষ্মন্ত-সমীপে গমন ও

প্রত্যাখ্যান, ষষ্ঠে রাজার বিরহ এবং সপ্তমে শকুন্তলার সহিত পুনর্ম্মিলন।” বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত ‘শকুন্তলা’ গ্রন্থ সর্ব্বজনপরিচিত। তাহা এই নাটকের অনুকরণে রচিত। সুতরাং বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেই ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলে’র মনোহর আখ্যানভাগের সহিত পরিচিত।

পুরুবংশীয় মহাপরাক্রান্ত সম্রাট্ দুষ্মন্ত সসৈন্যে মৃগয়া করিতে বাহির হইয়াছেন। একটি মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তিনি শর সন্ধান করিতে যাইবেন, ঠিক এমন সময় একদল ঋষি উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে নিষেধ করিলেন—“মহারাজ, এটি আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না।” রাজা নিবৃত্ত হইয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং ঋষিগণের নিকট হইতে জানিতে পরিলেন যে ইহা কুলপতি কণ্বের আশ্রম-সীমান্ত। কুলপ ত সম্প্রতি কন্যা শকুন্তলার উপর অতিথি সৎকারের ভার দিয়া সোমতীর্থে প্রস্থান করিয়াছেন। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে দেখিবেন মনে করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ও রথ পরিত্যাগ করিয়া আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। কিছুদূর যাইবার পর তিনটি তরুণী তাপসীকে তিনি আশ্রমবৃক্ষে জল সেচন করিতে দেখিলেন এবং অন্তরাল হইতে তাহাদের বাক্যালাপ শুনিয়া বুঝিলেন, ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী তাপসীই শকুন্তলা এবং অন্য দু’টি শকুন্তলার সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা। বল্কলখণ্ডমাত্রপরিহিতা নিরাভরণা শকুন্তলার অনবদ্য রূপরাশি দেখিয়া সৌন্দর্য্যজ্ঞ রাজা বুঝিলেন—“কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্”—সুন্দর আকৃতির

পক্ষে কোন্ বস্তু না ভূষণ হয়? সহসা একটি ভ্রমর শকুন্তলাকে আক্রমণ করিলে সখীদ্বয় রহস্য করিয়া প্রজাবৃন্দের রক্ষাকর্ত্তা রাজা দুষ্মন্তকে ডাকিতে বলিল। সেই সুযোগে রাজা অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, কিন্তু নিজেকে রাজকর্ম্মচারী বলিয়া পরিচয় দিয়া সখীদ্বয়ের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। রাজা জানিতে পারিলেন যে শকুন্তলা কুলপতি কণ্বের নিজের কন্যা নহেন—পালিতা কন্যা। শকুন্তলার পিতা বিশ্বামিত্র—মাতা অপ্সরীশ্রেষ্ঠা মেনকা। রাজা পূর্ব্বেই শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন—এখন তাঁহাকে বিবাহযোগ্যা ক্ষত্রিয়-কন্যা জানিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। শকুন্তলাও রাজার প্রতি অনুরক্তা হইলেন।

রাজা শিবিরে ফিরিয়া শকুন্তলার কথা ভাবিতে লাগিলেন। পরে তিনি বয়স্য বিদূষককে সব কথা বলিয়া পরামর্শ চাহিলেন! এমন সময় একদল আশ্রমনিবাসী ঋষি আসিয়া রাজাকে অসুর-দের আক্রমণ হইতে যজ্ঞ রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজা সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। সেই মুহূর্ত্তে রাজধানী হইতে দূত আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে রাজমাতার ব্রতোপলক্ষে রাজাকে রাজধানীতে উপস্থিত হইতে হইবে। রাজা মাতার আহ্বানেও ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতে পারিলেন না। তিনি বিদূষককে নিজের প্রতিনিধি করিয়া রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন, আর নিজে চলিলেন কণ্বাশ্রমে যজ্ঞ রক্ষা করিতে। যাত্রাকালে তিনি বিদূষককে বলিলেন যে শকুন্তলার উপাখ্যান

একটি পরিহাসবিজল্পিত মিথ্যা উপন্যাস মাত্র—বিদূষক যেন উহা সত্য বলিয়া মনে না করেন। আশ্রমে বাসকালে দুই সখীর সহায়তায় দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ হইল। যজ্ঞ শেষ হইয়া গেলে রাজা রাজধানীতে ফিরিবার কালে শকুন্তলাকে একটি স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরী দিলেন, আর বলিয়া গেলেন যে রাজধানীতে পৌঁছিয়াই তিনি শকুন্তলাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইবেন।

রাজা চলিয়া গিয়াছেন। শকুন্তলা সর্ব্বক্ষণ বসিয়া তাঁহার কথা ভাবেন, ভাবিতে ভাবিতে বাহ্য জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। একদা শকুন্তলা দুষ্মন্ত-ধ্যানে মগ্ন আছেন, এমন সময়ে মহর্ষি দুর্ব্বাসা আসিয়া বলিলেন—"অয়মহং ভো"—এই আমি আসিয়াছি। শকুন্তলার কর্ণে সে কথা প্রবেশ করিল না। অতিথির প্রতি অবহেলায় ক্রুদ্ধ হইয়া মহর্ষি শাপ দিলেন যে যাহার চিন্তায় তন্ময় হইয়া শকুন্তলা অতিথিকে তুচ্ছ করিল সেই প্রিয়জন শকুন্তলার কথা মনে করাইয়া দিলেও শকুন্তলাকে মনে করিতে পারিবে না। অনসূয়া প্রিয়ংবদা দূরে ছিল—ছুটিয়া গিয়া দুর্ব্বাসার পায়ে পড়িল। দুর্ব্বাসা শান্ত হইয়া বলিলেন যে শকুন্তলা যদি কোন চিহ্ন (অভিজ্ঞান) দেখাইতে পারে তবে লুপ্তস্মৃতি প্রিয়জনের স্মৃতিশক্তি উজ্জীবিত হইবে।

কুলপতি কণ্ব সোমতীর্থ হইতে ফিরিয়াছেন। তিনি দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পরিণয়ে সন্তুষ্ট হইলেন। এদিকে আশঙ্কা কাটিয়া

গেল ; কিন্তু রাজা দুষ্মন্তের কোন সংবাদ, কি তাঁহার কোন লোকজন আসিল না। শকুন্তলা গর্ভবতী, কাজেই কণ্ব তাঁহার দুই শিষ্যের সঙ্গে শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। শকুন্তলার পতিগৃহে যাইবার এই দৃশ্যটি কারুণ্যমাধুর্য্যে অতুলনীয়। শুধু আশ্রমের লোকজনের সহিতই নহে, তরুলতা পশুপক্ষী সকলের সঙ্গে শকুন্তলার যে নিবিড় যোগাযোগ তাহা কালিদাস আশ্চর্য্য কৌশলে পরিস্ফুট করিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত মানুষের চিত্তের সুগভীর সংযোগের এমন অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কন পৃথিবীর অন্য কোন প্রাচীন কবির পক্ষেই সম্ভব হয় নাই। শকুন্তলার বিদায়ের প্রাক্কালে সখীদ্বয় শকুন্তলাকে দুর্ব্বাসাবৃত্তান্ত না বলিয়া শুধু এইটুকু বলিয়া দিল যে রাজা যদি চিনিতে না পারেন তবে শকুন্তলা যেন তাঁহাকে তাঁহার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীটি দেখায়।

শকুন্তলা রাজসভায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা দুষ্মন্ত কণ্বশিষ্যদ্বয়ের মুখে যাবতীয় বৃত্তান্ত শুনিয়াও শকুন্তলাকে নিজের পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিলেন না, কারণ দুর্ব্বাসার অভিশাপে তাঁহার স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। শকুন্তলার প্রাণপণ চেষ্টাতেও রাজার স্মরণ হইল না যে তিনি কণ্বাশ্রমে শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়াছেন বা দেখিয়াছেন। তখন অভিজ্ঞান দেখাইতে গিয়া শকুন্তলা দেখিলেন যে অঙ্গুলীতে রাজপ্রদত্ত অঙ্গুরীটি নাই, বুঝিলেন যে শচীতীর্থে স্নান করিবার কালে তাহা জলে পড়িয়া গিয়াছে। নিরুপায় হইয়া শকুন্তলা কাতর-

কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। তখন স্বর্গ হইতে মেনকা আসিয়া শকুন্তলাকে লইয়া গেলেন।

কিছুদিন পরে এক ধীবর রোহিত মাছের পেট হইতে একটি অঙ্গুরী পাইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে গেলে রাজপুরুষেরা রাজার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী দেখিয়া ধীবরকে চৌর্য্যাপরাধে ধরিয়া আনিল। সেই অঙ্গুরীটি দেখিয়া রাজার পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিল। তখন তিনি দুঃসহ অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন এবং শকুন্তলার প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়া নিজের চিত্তকে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করিলেন। এই ভাবে যখন দুষ্মন্ত দুঃখে ও অনুতাপে কাল কাটাইতেছেন তখন দেবরাজ ইন্দ্রের সারথি মাতলি আসিয়া দানবদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহাকে লইয়া গেল। দানবদিগকে বধ করিয়া স্বর্গ হইতে ফিরিবার পথে দুষ্মন্ত মহর্ষি মরীচির আশ্রমে অবতরণ করিলেন। সেইখানে তিনি একটি বলশালী শিশুকে দেখিয়া অত্যন্ত স্নেহার্দ্র ও কৌতূহলী হইলেন। শিশুটি একটি সিংহ-শিশুর মুখে দাঁত গণিতেছিল। শিশুটি তাঁহারই সন্তান, শকুন্তলার গর্ভজাত। তখন সেইখানে শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের পুনর্ম্মিলন হইল।

'অভিজ্ঞানশকুন্তলে'র আখ্যানভাগ জানিলেই কালিদাসের রচনা পাঠের ফললাভ হয় না। কবির কল্পনার বৈচিত্র্য, বর্ণনার মাধুর্য্য, চরিত্র অঙ্কনের চাতুর্য্য, মানবমনের অন্তর্নিহিত রহস্য বিশ্লেষণের অনন্যসাধারণ শক্তি প্রভৃতির

আস্বাদ মূলের সহিত পরিচয় না থাকিলে পাওয়া যায় না। অনসূয়া-প্রিয়ংবদা সখীদ্বয়কে কালিদাস কি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন! শকুন্তলার সহিত মালবিকা বা উর্ব্বশীর তুলনাই হয় না। প্রকৃতি-পালিতা, তপোবনের প্রশান্ত আবেষ্টনীতে লালিতা, সরলা শকুন্তলা যেন প্রকৃতিরই কন্যা; মানব-সমাজের কোনও কৃত্রিমতা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার চিত্র সুকরুণ হৃদয়-মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব বাণীরূপ। রাজসভায় মুগ্ধহৃদয়া, সারল্যময়ী, প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার করুণ চিত্র কত মর্ম্মস্পর্শী! তিনি প্রগল্‌ভার ন্যায় বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই—আন্তরিকতার সহিত মর্ম্মের আক্ষেপবাণী প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। আর দুষ্মন্তের চরিত্র কত শুভ্র ও নিষ্কলঙ্ক! তিনি আদর্শ রাজা, আদর্শ প্রেমিক। কালিদাস দেখিলেন, মহাভারতের দুষ্মন্ত-চরিত্র রাজোচিত ত নয়ই, ক্ষত্রোচিতও নয়। তাই কবি মহাভারতের উপাখ্যানে যাহা নাই সেই দুর্ব্বাসার শাপের অবতারণা করিয়া দুষ্মন্ত চরিত্রের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া তাঁহাকে মহত্ত্বে মণ্ডিত ও উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন।

'অভিজ্ঞানশকুন্তল' সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার চরম নিদর্শন। ইহা কবির কাব্যসৃষ্টির চরম উৎকর্ষ। রসজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ বলেন, "কালিদাসস্য সর্ব্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্"—এই নাটক কবির সর্ব্বস্ব। প্রেম ও ধর্ম্মের পবিত্র মিলনমহিমায় ইহা চির ভাস্বর। এই নাটকের যে কোন চরিত্র আমরা আলোচনা

করি, যে কোন বর্ণনা আমরা উপভোগ করি, যে কোন নিসর্গ-চিত্র আমরা পর্য্যবেক্ষণ করি, তাহাতেই আমরা বিস্মিত, মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া যাই।

মহাকবিজনোচিত বিনয়েও কালিদাস অপরাজেয়। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'রঘুবংশ' লিখিতে বসিয়া প্রারম্ভেই তিনি বলিয়াছেন—

"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥"

—আমি অভাজন হইয়াও কবিযশঃপ্রার্থী হইয়াছি, সুতরাং বামন যেমন লোভের বশে দীর্ঘ-দেহ পুরুষের লভ্য ফল গ্রহণের জন্য বাহু উত্তোলন করিয়া উপহসিত হয়, আমিও সেইরূপ উপহাসাস্পদ হইব।

'অভিজ্ঞানশকুন্তলে'ও তিনি অনুরূপ কথা বলিয়াছেন—

"আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।"

বিদ্বন্মণ্ডলী পরিতুষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত প্রয়োগবিজ্ঞানের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার করা চলে না।

বলা বাহুল্য যে উভয় ক্ষেত্রেই কবির আশঙ্কা অমূলক। তিনি যে কবিত্ব ও রচনা-পারিপাট্য প্রদর্শন করিয়াছেন, পাঠকের এবং দর্শকের হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যেরূপ সহৃদয়তার সহিত এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে সকল যুগের বিদ্বন্মণ্ডলী সত্যই মুগ্ধ হইয়াছেন। ইহা শ্রব্যকাব্য রূপে যেরূপ সমাদৃত, দৃশ্যকাব্য রূপেও সেইরূপ প্রশংসিত। "দুষ্মন্ত প্রকৃত পুরুষ বলিয়াই পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিলেন।

মহাকবি তাঁহার বিশাল চিত্রপটে এই আশ্চর্য্য পরিণতি আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। সে চিত্রের বিস্তার পৃথিবী হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত। সে চিত্রে গ্রীক নাটকের আকারগত সৌন্দর্য্য, জার্ম্মান নাটকের প্রণালীগত আধ্যাত্মিকতা এবং ইংরাজী নাটকের কার্য্যগত জীবন্তভাব পূর্ণমাত্রায় লক্ষিত হয়। সেই সৌন্দর্য্যপূর্ণ ভাবগম্ভীর গূঢ় রহস্যব্যঞ্জক মহাপটের নাম 'অভিজ্ঞানশকুন্তল'।"

সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা কালিদাসের কাব্যের গভীরতা ও মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। হিমালয়ের মত তাঁহার কাব্য অনন্তরত্নপ্রভব—"বর্ণিলে জীবনকাল না ফুরাবে তবু।"

সংস্কৃতে একটি কথা আছে—"উপমা কালিদাসস্য"। কাব্যের প্রধান গুণ মনোরম উপমা প্রয়োগ এবং বিভিন্ন অলঙ্কারের সুষ্ঠু ব্যবহার। কালিদাসের ভাষার সঙ্গীতধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে ছন্দে এবং শব্দালঙ্কারে। 'রঘুবংশে' সমুদ্রের বেলাভূমি বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন—"তমালতালীবনরাজিনীলা আভাতি বেলা"—সমুদ্রের বেলাভূমি তমালতালীবনরাজি দ্বারা নীল। এই কয়টি কথা শব্দালঙ্কারের ঝঙ্কারে চিরপ্রসিদ্ধ। 'কুমারসম্ভবে'র নায়িকা উমা—"সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব"—সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায়। যোগাসনস্থ মহেশ্বরকে বলা হইয়াছে যেন "নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্"—বায়ুহীন স্থানে নিস্পন্দ দীপশিখার ন্যায়। মদনভস্মের সূচনায় "হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ"—

চন্দ্রোদয়ের আরম্ভে সিন্ধুজলরাশির ন্যায় মহাদেব কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্য হইলেন। যোগীশ্বরের যোগমগ্ন প্রশান্ত চিত্তের চাঞ্চল্যকে ইহা অপেক্ষা আর সুন্দররূপে অভিব্যক্ত করা যায় না। স্বয়ংবর সভায় ইন্দুমতী—"সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ"—রাত্রিতে সঞ্চারিণী দীপশিখার মত। আর কোন সংস্কৃত কবির কাব্যে অর্থালঙ্কারের চমৎকারিত্ব এত মনোহর ভাবে পরিস্ফুট হয় নাই। কালিদাসের উপমাগুলির মধ্যে যেমন সমানধর্ম্মের যথাযথতা তেমনি ইহাদের মধ্যে অনেক ব্যঞ্জনা, অনেক ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন থাকে—সেই ব্যঞ্জনার অস্ফুট আভাস স্পষ্ট অর্থকে আরও গভীরতা, আরও রহস্য দান করে। উপমা কত বিচিত্র, কত বিরাট, কত মৌলিক, কত পবিত্র হইতে পারে তাহা কালিদাসের ন্যায় আর কোন্ কবি প্রদর্শন করিয়াছেন?

কালিদাসের কবিত্ব বিশ্বসাহিত্যের পরিষদে সমগ্র ভারতের মর্য্যাদাই সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাই বাঙ্গালার মহাকবি মাইকেল মধুসূদন বলিয়াছেন—

"কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি পিক-কুল-পতি।
... ... লন্দ্র সদনে
লভি জন্ম মন্দাকিনী (আনন্দ জগতে !)
নাশেন কলুষ যথা এ তিন ভুবনে ;
সঙ্গীত-তরঙ্গ তব উথলি ভারতে
(পুণ্যভূমি) ! হে কবীন্দ্র ! সুধা বরিষণে
দেশ-দেশান্তরে কর্ণ তোষে সেই মতে।"

আমীর খস্‌রু

"আলাউদ্দীন খল্‌জীর রাজত্বকালে যে সকল কবি বর্ত্তমান ছিলেন তাঁহাদের ন্যায় কবি উক্ত সুল্‌তানের রাজত্বকালের পূর্ব্বে অথবা পরে আর কখনও আবির্ভূত হন নাই। রচনার প্রাচুর্য্যে এবং ভাবের মৌলিকতায় আমীর খস্‌রু অদ্বিতীয় অতুলনীয়। অন্যান্য সাহিত্যিকগণের মধ্যে কেহ গদ্যে এবং কেহ পদ্যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু আমীর খস্‌রু সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ। বিভিন্ন শ্রেণীর পদ্য রচনায় তাঁহার ন্যায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ কোন কবি পূর্ব্বে কখনও আবির্ভূত হন নাই এবং সম্ভবতঃ শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত আর আবির্ভূত হইবেন না।"

—জিয়াউদ্দীন বরণী প্রণীত 'তারিখ-ই-ফিরোজসাহী'

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে সিন্ধুদেশ আরবজাতীয় মুসলমানগণের অধিকৃত হয়। সেকালে মুসলমান-সভ্যতা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং নানাদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু সিন্ধুদেশের অধিপতি হইয়াও মুসলমানগণ ভারতবর্ষে তাঁহাদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। প্রতাপশালী রাজপুত রাজগণ তখন ভারতের উত্তর ও পশ্চিম প্রান্তে হিন্দু-সভ্যতার দ্বাররক্ষক রূপে বর্ত্তমান ছিলেন।

একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গজনীর অধিপতি মহাবীর

সুল্‌তান মামুদ বার বার ভারতবর্ষ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া রাজপুত রাজগণের ক্ষমতা খর্ব্ব করেন। সমগ্র ভারতে মুসলমান-অধিকার স্থাপন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না; কেবলমাত্র পঞ্জাব স্বরাজ্যভুক্ত করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট রহিলেন। তাঁহার বংশধরগণ প্রায় দেড়শত বৎসর পঞ্জাবে রাজত্ব করেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে আফগানিস্থান, পারস্য এবং মধ্য-এশিয়া হইতে বহু মুসলমান ভারতবর্ষে আগমন করিয়া পঞ্জাবে স্থায়ী ভাবে বাস করে। এইরূপে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ক্রমশঃ যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং ভারতবর্ষে মুসলমান-সভ্যতার বিস্তারের সূত্রপাত হয়। পঞ্জাবের মুসলমান রাজগণ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পারসী গীতিকবিতা শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় ভারতবাসী মুসলমানগণ পারসী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের সাহিত্যিক মূল্য কতখানি ছিল তাহা নির্দ্ধারণের উপায় নাই।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঘূর রাজ্যের সেনাপতি মুইজ-উদ্দীন মহম্মদ উত্তর ভারতে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। দিল্লী মুসলমান সাম্রাজ্যের রাজধানী হইল। হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া বহু ভাগ্যান্বেষী মুসলমান ভারতবর্ষে আসিতে লাগিল। পঞ্জাব হইতে পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত মুসলমান-সভ্যতা প্রচারিত হইতে লাগিল। মুসলমান রাজগণের উৎসাহদানে

ও পোষকতায় পারসী ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হইল। সেকালের মুসলমান গ্রন্থকারগণের মধ্যে অমর কবি আমীর খস্‌রু শীর্ষ-স্থানীয় ছিলেন। তাঁহার প্রতিভার জ্যোতিঃ পরবর্ত্তী কবিগণের প্রতিভা ম্লান করিয়া দিয়াছিল। সমসাময়িক কবিদের মধ্যে ইনি যেন সহস্র রশ্মিতে দীপ্তি পাইতেন।

আমীর খস্‌রু তুর্কিজাতীয় ছিলেন। তাঁহার পিতা আমীর সৈফউদ্দীন মামুদ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সম্ভবতঃ বল্‌খ্‌ দেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং দিল্লীর সুলতান ইল্‌তুৎমিসের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন। ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে বাস করিবার সঙ্কল্প করিয়া তিনি বর্ত্তমান আগ্রা-অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত ইটাবা জেলায় পটিয়ালী গ্রামের অধিবাসী হ'ন। সম্ভবতঃ ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে এই গ্রামে আমীর খস্‌রু জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং অভারতীয় ভাষায় কাব্য রচনা করিলেও তাঁহাকে ভারতের কবিই বলা যায়।

আমীর সৈফউদ্দীন স্বয়ং নিরক্ষর হইলেও পুত্রের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে অকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন কিশোর আমীর খস্‌রু তাঁহার মাতামহের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। এই মাতামহ দিল্লীর সুলতান গিয়াস্‌উদ্দীন বল্‌বনের দরবারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সাহায্যে আমীর খস্‌রু অল্প বয়সেই বল্‌বনের দরবারে স্থান লাভ করেন। এইরূপে তাঁহার উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়।

সুল্‌তান বল্‌বন সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; আমীর

খস্‌রুর সুমধুর কবিতাবলী শীঘ্রই তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। ফলে তরুণ কবি সুল্‌তানের কনিষ্ঠ পুত্র বুঘ্‌রা খাঁর পার্শ্বচর নিযুক্ত হইলেন। কিছুদিন পরে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা তুঘ্রিল খাঁ বিদ্রোহী হইলে বল্‌বন তাঁহাকে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে বঙ্গদেশে আগমন করিলেন। বুঘ্‌রা খাঁ এবং আমীর খস্‌রু তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। বিদ্রোহ দমনের পর বল্‌বন বুঘ্‌রা খাঁকে বাঙ্গালার শাসনভার অর্পণ করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আত্মীয়-স্বজন ফেলিয়া এই দূরদেশে বাস করা আমীর খস্‌রুর ভাল লাগিল না; জলপ্লাবিত বাঙ্গালা দেশ তাঁহার কবি-চরিত্রের পক্ষে অনুকূল হইল না। তাই সুলতানের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন; বুঘ্‌রা খাঁর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হইল।

দিল্লীতে যাইয়া আমীর খস্‌রু বল্‌বনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ খাঁর পার্শ্বচর হইলেন। মহম্মদ খাঁ তখন মূলতান প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আমীর খস্‌রু তাঁহার সহিত তিন বৎসর মূলতানে বাস করিলেন। মহম্মদ খাঁও পিতার ন্যায় সাহিত্য-রসিক ও কাব্যরসপিপাসু ছিলেন। তিনি পারস্যের মহাকবি সাদীকে ভারতবর্ষে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাদীর দেহ তখন জরাজীর্ণ, মৃত্যুর প্রাক্কালে বড় সাধের সিরাজ নগর পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেশে আসিতে তিনি স্বীকৃত হইলেন না। মহম্মদ খাঁর নিমন্ত্রণের উত্তরে তিনি স্বরচিত কয়েকটি কবিতা স্বহস্তে নকল করিয়া তাঁহাকে উপহার স্বরূপ প্রেরণ

করিলেন। আমির খস্‌রুর কবিত্বের যশ সুদূর পারস্যেও পৌঁছিয়াছিল। সাদী মহম্মদ খাঁর নিকট লিখিত পত্রে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

বল্‌বনের রাজত্বকালে চিঙ্গীজ খাঁর বংশধরগণের শাসনাধীন দুর্দ্দান্ত মোঙ্গলগণ বারংবার পঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছিল। তাহারা তখনও ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই; নানা দেব-দেবী এবং ভূত-প্রেত তাহাদের উপাস্য ছিল। এজন্য মুসলমানগণ তাহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিত, তাহারাও মুসলমান-দিগকে নির্ম্মূল করিতে চেষ্টা করিত। বল্‌বন স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্রের উপর সীমান্ত রক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। মহম্মদ খাঁ বহু যুদ্ধে মোঙ্গলদিগকে পরাজিত করিয়া বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এক খণ্ডযুদ্ধে মোঙ্গলেরা তাঁহাকে হত্যা করিল। এই শোকাবহ ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া আমীর খস্‌রু একটি মর্ম্মস্পর্শী কবিতা রচনা করেন। মোঙ্গলেরা কবিকেও বন্দী করিয়াছিল, কিন্তু তিনি কৌশলে মুক্তিলাভ করেন।

প্রিয়পুত্র মহম্মদের শোকে বল্‌বন অল্পদিনের মধ্যেই শয্যাগত হইয়া পড়িলেন এবং কিছুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন বুঘ্‌রা খাঁর পুত্র কায়কোবাদ। তিনি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও বিলাসী ছিলেন। মহম্মদের শত্রুরাই তাঁহার দরবারে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, সুতরাং মহম্মদের প্রিয় সহচর আমীর খস্‌রুর স্থান সেখানে ছিল না। এই সময়ে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা ছিলেন হাতিম খাঁ।

দানশীলতার জন্য তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। দুই বৎসর হাতিম খাঁর আশ্রয়ে বাস করিয়া আমীর খস্‌রু দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। এবার সুলতান কায়কোবাদ তাঁহাকে সাদরে সভাসদ্‌রূপে গ্রহণ করিলেন। কায়কোবাদের রাজত্ব-কালের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া আমীর খস্‌রু একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই অকর্ম্মণ্য ও রুগ্ন কায়কোবাদকে হত্যা করিয়া তাঁহার এক সেনাপতি জালালউদ্দীন খল্‌জী সিংহাসন অধিকার করিলেন। নূতন সুলতানের সহিত আমীর খস্‌রু পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ পরিচিত ছিলেন। জালালউদ্দীন কবিকে পরম সমাদরে প্রধান পারিষদ রূপে বরণ করিলেন। সুলতান স্বয়ং কবি এবং সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক ছিলেন। তাঁহার সভায় বহু কবি ও গায়ক সমবেত হইয়াছিলেন। আমীর খস্‌রু তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য বহু উৎকৃষ্ট 'গজল' রচনা করিলেন। ইহা ছাড়া সুলতানের অভিযানসমূহ বর্ণনা করিয়া তিনি একখানি ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করিলেন।

মাত্র ছয় বৎসর রাজত্ব করিয়াই জালালউদ্দীন প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দীনের চক্রান্তে নিহত হন। আলাউদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আমীর খস্‌রুকে পূর্ব্বপদে বহাল রাখিলেন। আলাউদ্দীন স্বয়ং নিরক্ষর ছিলেন, জালালউদ্দীনের ন্যায় কবি-প্রতিভা বা রসজ্ঞতা তাঁহার ছিল না; কিন্তু সেজন্য তিনি যে সে যুগের সাহিত্যিকগণের প্রতি

দরদী ছিলেন না তাহা নহে। তবে সম্ভবতঃ তিনি আমীর খস্‌রুর প্রতি যথোচিত সমাদর প্রদর্শন করেন নাই। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরণী দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "আমীর খস্‌রুর ন্যায় কবি সুল্‌তান মামুদের রাজত্বকালে আবির্ভূত হইলে তিনি তাঁহাকে বিস্তৃত জায়গীর প্রদান করিতেন অথবা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিতেন; কিন্তু আলাউদ্দীন এরূপ কবিকে যথোচিত সমাদর না করিয়া মাত্র সহস্র তঙ্কা দিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন।" তথাপি আমীর খস্‌রু মুক্তকণ্ঠে আলাউদ্দীনের গুণগান করিয়াছেন। বরণীও একথা স্বীকার করিয়াছেন যে শিল্পে ও সাহিত্যে আলাউদ্দীনের রাজত্বকাল বাগ্দাদ, কায়রো এবং কন্‌ষ্ট্যান্টিনোপ্‌লের সুলতানগণের রাজত্বকালের সমকক্ষ ছিল। তাঁহারই রাজত্বকালে আমীর খস্‌রুর কাব্য চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এই সময়ে রচিত আমীর খস্‌রুর কবিতাগুলি ভাব-গভীরতায়, ভাষা-মাধুর্য্যে ও ছন্দো-ঝঙ্কারে পরম উপাদেয়। এতদিনে তাঁহার প্রতিভা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিল। আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে তিনি বহু সরস সুন্দর কবিতা এবং একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মোবারক খল্‌জী দিল্লীর সুলতান হইলেন। আমীর খস্‌রু পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতানগণের ন্যায় তাঁহারও অনুগ্রহ লাভ করিলেন। সম্ভবতঃ আলাউদ্দীন অপেক্ষা মোবারক কবির প্রতি অধিকতর বদান্যতা

প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আমীর খস্‌রু সুলতান মোবারকের কীর্ত্তি বর্ণনা করিয়া একখানি ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

মোবারক অকালে নিহত হইলে গিয়াস্‌উদ্দীন তুঘ্‌লুক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। আমীর খস্‌রু তাঁহার অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইলেন না। গিয়াস্‌উদ্দীনের রাজত্বকালের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি একখানি কাব্য রচনা করিলেন। সুল্‌তান বিদ্রোহ দমনের জন্য বঙ্গদেশে আগমন করিলে কবিও তাঁহার অনুবর্ত্তী হন। দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অল্পদিন পরেই আমীর খস্‌রুর মৃত্যু হয়।

সেকালের বিখ্যাত ফকির নিজামউদ্দীন আউলিয়া আমীর খস্‌রুর ধর্ম্মজীবনের উপর বিশেষ প্রভাব সঞ্চার করিয়াছিলেন। ১২৩৮ খৃষ্টাব্দে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত বদাউন সহরে তাঁহার জন্ম হয়; ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে তিনি পরলোক-গমন করেন। তাঁহার পিতামহ বোখারা হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। নিজামউদ্দীন অল্প বয়সেই পাণ্ডিত্য এবং ধর্ম্মানুরাগের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। সাংসারিক ঐশ্বর্য্য বা রাজনৈতিক প্রভাবের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না। সুল্‌তান আলাউদ্দীন খল্‌জী একবার শাসন-সংক্রান্ত কয়েকটি প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁহার মতামত চাহিয়াছিলেন। ফকির উত্তর দিলেন, "রাজকার্য্য সম্বন্ধে দরবেশের কোন বক্তব্য নাই।" সুল্‌তান এই উত্তরে বিশেষ প্রীত হইয়া ফকিরের সহিত সাক্ষাৎ

করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার বাড়ীতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নিজামউদ্দীন একথা শুনিয়া বলিলেন, "এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির গৃহে দুইটি দরজা আছে। যদি সুলতান এক দরজা দিয়া ঘরে প্রবেশ করেন তবে আমি অপর দরজা দিয়া বাহির হইয়া যাইব।" সুল্‌তান অতঃপর আর কখনও তাঁহাকে বিরক্ত করেন নাই। দিল্লীতে এখনও নিজামউদ্দীনের দরগা ও সমাধি বর্ত্তমান আছে।

নিজামউদ্দীন কিছুদিন আমীর খস্‌রুর মাতামহের বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন। আমীর খস্‌রু মাত্র আট বৎসর বয়সে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে নিজামউদ্দীন তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কাব্য রচনায় উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে ফকীরের প্রভাবে কবির মনে ধর্ম্মপিপাসা জাগিয়াছিল। আমীর খস্‌রু প্রায়ই নিজামউদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। তিনি বহু কবিতায় ফকীরের প্রশংসা করিয়াছেন; কোন কোন কবিতায় সুলতানের নামের পূর্ব্বেই ফকীরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

আমীর খস্‌রুর কাব্য-গ্রন্থাবলী নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। তিনি বহু ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল কবিতায় তাঁহার অনন্যসাধারণ কৌতুকপ্রিয়তা এবং পারসী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ এই সকল খণ্ড কবিতায় হয় নাই। 'মস্‌নবী', 'কাসিদা' এবং 'গজল'

নামক তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত যে সকল কবিতা তিনি রচনা করিয়াছেন তাহাই তাঁহার প্রতিভার পরিচায়ক। তাঁহার অধিকাংশ 'মস্‌নবী' ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত, কিন্তু নীরস বিষয়বস্তুও তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার স্পর্শে সরসতা লাভ করিয়াছে। অলঙ্কারের বাহুল্য এবং ছন্দের বিধিবাঁধন কবি আমীর খস্‌রুর কল্পনার উদ্দাম গতিকে প্রতিহত করিতে পারে নাই।

তাঁহার রচিত 'মস্‌নবী'গুলির মধ্যে দেবলারাণী ও খিজির খাঁর প্রেম সংক্রান্ত পুস্তকটিই কাব্যাংশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দেবলারাণী গুজরাটের বাঘেলা বংশীয় রাজা দ্বিতীয় কর্ণের কন্যা ছিলেন। আলাউদ্দিন খল্‌জী গুজরাট জয় করিলে কর্ণ দক্ষিণাপথে পলায়ন করেন। তাঁহার পত্নী কমলা এবং কন্যা দেবলা দিল্লীতে যাইতে বাধ্য হন। আলাউদ্দিন স্বয়ং কমলাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন, দেবলার সহিত আলাউদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির খাঁর বিবাহ হয়। আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রিয় সেনাপতি মালিক কাফুর খিজির খাঁর চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাঁহাকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন। বন্দী অবস্থায় খিজির খাঁর সঙ্গিনী ছিলেন দেবলা। কিছুদিন পরে সুলতান মোবারক খল্‌জীর আদেশে খিজির খাঁকে হত্যা করা হয়। এই করুণ কাহিনী আমীর খস্‌রুর বর্ণনায় এমন জীবন্ত ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে যে কোন পাঠকই ইহা পাঠ করিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন না।

তাঁহার রচিত অন্য কোন 'মস্‌নবী' এত হৃদয়গ্রাহী হয় নাই, কারণ সুল্‌তানগণের গুণগান করিয়া তাঁহাদের প্রীতিভাজন হইবার উদ্দেশ্যেই কবি সেগুলি রচনা করিয়াছিলেন।

পারস্য দেশের সুপ্রসিদ্ধ কবি নিজামীর অনুকরণে আমীর খস্‌রু 'মস্‌নবী'গুলি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "উচ্চাভিলাষপরিপূর্ণ হৃদয়ে আমি নিজামীর মোহিনী শক্তির অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; আমার আশা ছিল যে আমিও তাঁহার ছন্দের অনুসরণ করিয়া পাঠকের মন মুগ্ধ করিতে পারিব। এখন আমি আমার অক্ষমতার পরিচয় পাইয়া নিজামীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেছি।" কাব্যাংশে আমীর খস্‌রুর 'মস্‌নবী'গুলি নিজামীর রচনার ন্যায় মধুর না হইলেও সেগুলি ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে বিশেষ মূল্যবান্। কায়কোবাদ, জালালউদ্দিন, আলাউদ্দিন, মোবারক এবং গিয়াস্‌উদ্দিন তুঘ্‌লুকের শাসনকালের ইতিহাস রচনা করিতে হইলে আমীর খস্‌রুর গ্রন্থাবলীর উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হইবে। প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য কবি সময় সময় অতিরঞ্জন এবং সত্যগোপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সমসাময়িক বিবরণ হিসাবে তাঁহার রচনাবলীর বিশেষ মূল্য আছে।

আমীর খস্‌রু গদ্যেও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু গদ্য রচনায় তিনি তেমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। কাব্যই তাঁহার পক্ষে ভাবপ্রকাশের স্বাভাবিক বাণীরূপ ছিল। তাঁহার গদ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'খজাইন-উল-ফুতুহ' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

এই গ্রন্থে আলাউদ্দীনের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

আমীর খস্‌রু তাঁহার একখানি গ্রন্থে সেকালের হিন্দুদের ধর্ম্ম, সামাজিক অবস্থা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কবি-চিত্তের উদারতার পরিচায়ক। তাঁহার জন্মভূমি ভারতবর্ষ খোরাসান হইতে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট ও উন্নত, ইহা তিনি গর্ব্বের সহিত উল্লেখ কয়িয়াছিলেন।

"খোরাসনী ক হিন্দি গরদেশই-ঘুল
কসে ওয়াসৎ নিজদস তাম্বুল।
সিয়াহ গোয়ন্দ হিন্দু হামচুঁনি অস্ত
সোয়াদ-ই আজাদই আলম হমী অস্ত।
বেহেস্তে তরজ কুন ইন হিন্দুস্তান রা
অজকুজা নিসবৎ অস্ত ইন বোঁস্তারা।
... ...
অজকুজা গঙ্গা-ই-হিন্দুস্তান ববদ্ দূর
য নীল ওয়া দিজলা লফদ হস্ত মাজুর।"

"খোরসানীরা বলে, হিন্দুস্তানের লোকেরা বিদ্রোহী ভূত। যে জঙ্গলের ফল খাইয়াছে সে তাম্বুলের আস্বাদন কি জানে? ইহা সত্য যে হিন্দু কৃষ্ণবর্ণের, কিন্তু এই দেশ সকল দেশ হইতে সেরা।...স্বর্গের সহিত নিশ্চয়ই হিন্দুস্থানের সম্বন্ধ আছে।......যে হিন্দুস্থানের গঙ্গা হইতে দূরে থাকে তাহার কাছে নীল ও টাইগ্রীস নদীর জল বড় সুমিষ্ট!"

আমীর খস্‌রু বলিয়াছেন যে হিন্দুরা দর্শনশাস্ত্রের সকল শাখায় অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল; বিভিন্ন দেশ

হইতে শিক্ষার্থীরা ভারতবর্ষে আগমন করিত, কিন্তু হিন্দুরা বিদ্যাচর্চ্চায় এত উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে তাহাদের কখনও জ্ঞানলাভের জন্য বিদেশে যাইতে হইত না। হিন্দু ধর্ম্মের সহিত ইস্‌লাম ধর্ম্মের কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, ইহা আমীর খস্‌রু লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে উভয় ধর্ম্মই ঈশ্বরের অসীমত্ব স্বীকার করে। হিন্দুদের মূর্ত্তিপূজার আধ্যাত্মিক মর্ম্মও তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে হিন্দুদের মতে দেবদেবীর মূর্ত্তি ঈশ্বরের বিভিন্ন বিভূতির প্রতীক মাত্র। সেকালে হিন্দু ও মুসলমানের সংস্কৃতি যে ধীরে ধীরে মিলনের পথে অগ্রসর হইতেছিল আমীর খস্‌রুর রচনাবলীতে আমরা তাহার পরিচয় পাই।

তুলসীদাস

বিশাল হিন্দী সাহিত্যে তুলসীদাসী রামায়ণের ন্যায় সর্ব্বজনপ্রিয় কাব্য আর নাই। এই গ্রন্থের ভক্ত পাঠকের সংখ্যার ইয়ত্তা নাই। সমগ্র ভারতবর্ষে আর কোন ভাষায় রচিত একখানি পুস্তক এত লোকে পড়ে না। সমগ্র ভারতের হিন্দীভাষী "স্ত্রীপুরুষ ইহা পড়িয়া আশা মিটাইতে পারে না। ইহার অন্তরের মাধুর্য্য এত বেশী যে, ইহা নিজের গুণে হিন্দুস্থানের সকল হিন্দি-ভাষী বা হিন্দী-জানা লোকের হৃদয় অধিকার করিয়াছে। এমন হিন্দী-ভাষী চাষী নাই, যে ইহার দুই-দশটা চোপাই বা দোঁহা না জানে ও প্রয়োজন মত উল্লেখ না করিয়া থাকে।"

কৃত্তিবাসী রামায়ণের সহিত তুলসীদাসী রামায়ণের তুলনা হয় না। তুলসীদাসী রামায়ণে "গল্পাংশ বড়ই কম। যাহাতে রামের প্রতি ভক্তি হয়, যাহাতে মানুষ নীতি-পথ চিনিয়া লইতে পারে ও তদনুযায়ী আচরণ করিতে পারে, তুলসীদাস তাহার অবলম্বন দিয়াছেন। ঘটনাগুলিও এমন করিয়া সাজানো হইয়াছে যে, তাহাতে এবং বর্ণনায় এই ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, রাম-সীতা যেমন একদিক দিয়া আমাদের হৃদয়-রাজ্যের রাজাসনে বসিয়াছেন, অমনি আবার আর একদিক দিয়া আমাদের ঘরে আমাদের ছেলে-মেয়ে-বধূ হইয়াও

বসিয়াছেন। রাম-সীতা-ভরতাদির কথা ভা।বতে তুলসীদাস আমাদিগকে রাজবাড়ীতে লইয়া যান নাই, কাঙ্গালের ঘরের ছেলে-মেয়ে-বউ দিয়াই তৃপ্ত করিয়াছেন। তিনি রামের গলায় সোনার হার ও সীতার গায়ে মণিমুক্তার ভূষণ দিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেগুলি নিতান্তই আলগোচে গায়ে লাগিয়া আছে, উহা তাঁহাদের পরিচ্ছদের অংশ নয়—মামুলি ভাবে রাজার ছেলে-বউকে দিতে হয় বলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের চালচলন কথাবার্ত্তা গ্রামের যে কোনও গরীবের ঘরে খাপ খায়।" প্রকৃতপক্ষে রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে তুলসীদাস সাধারণ লোকের আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া দিয়াছেন, জনসাধারণের সহিত কোশল রাজবংশের পার্থক্য মুছিয়া ফেলিয়াছেন।

"কেবল তাহাই নয়। গীতার আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলিও নীতি ও আচরণের ভিতর দিয়া তিনি স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। রামায়ণের কাব্য-সৌন্দর্য্যও অতুলনীয়। এমন সহজ ভাষায়, এমন গ্রাম্য কথায়, এমন ভাব তুলসীদাস প্রকাশ করিয়াছেন যে মনে হয়—এক সংস্কৃত ভাষা ছাড়া আর কোন অলঙ্কারময় ভাষাতেই যেন সে ভাব প্রকাশ করা যাইত না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য সর্ব্বসাধারণের চলিত ভাষায় লেখা হইলে যাহা হয়, তুলসীদাসী রামায়ণ তাহাই।"

তুলসীদাসের বিশ্বাসযোগ্য জীবনী রচনার উপাদানের একান্ত অভাব। তাঁহার জন্মের স্থান ও সময়, তাঁহার পিতামাতার নাম, তাঁহার পারিবারিক জীবন প্রভৃতি সম্বন্ধে

নানারূপ গল্প ও প্রবাদ প্রচলিত আছে। সম্ভবতঃ আগ্রা-অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত বান্দা জেলার রাজপুর গ্রামে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং ৯২ বৎসর বয়সে ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে বারাণসীধামে তিনি দেহত্যাগ করেন। মতান্তরে ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিয়াছিল। তিনি জাতিতে কনৌজী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল আত্মারাম, মাতার নাম হুলসী। গৃহস্থাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল রামবোলা। বাল্যকালেই তুলসীদাস মাতা পিতা দুইই হারাইয়াছিলেন ; আত্মীয়স্বজনদের অবহেলার মধ্যে তাঁহার শৈশবকাল কাটিয়াছিল। কথিত আছে, স্ত্রীর গঞ্জনায় তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া বিরাগী হইয়া কাশীতে উপস্থিত হন। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ কাল কাশীতেই কাটিয়াছিল, তবে মধ্যে মধ্যে তিনি অযোধ্যা, চিত্রকূট, বৃন্দাবন, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, রাজা মানসিংহ ও আবদুর রহিম খানখানান তাঁহার গুণমুগ্ধ বান্ধব ছিলেন, কিন্তু সম্রাট্ আকবরের দরবারের সহিত তাঁহার কোন সংযোগ ছিল বলিয়া মনে হয় না। তিনি ছয়খানি বড় ('দোহাবলী', 'গীতাবলী', 'বিনয় পত্রিকা', 'কবিত্ব রামায়ণ', 'রামাজ্ঞা', 'রামচরিতমানস') ও ছয়খানি ছোট ('রামলীলা নহছু', 'বরবৈ রামায়ণ', 'জানকী মঙ্গল', 'বৈরাগ্য-সন্দীপনী', 'পার্ব্বতী-মঙ্গল', 'কৃষ্ণ গীতাবলী') গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

তুলসীদাসের রামায়ণের নাম 'রামচরিতমানস' অর্থাৎ রামের চরিত্র রূপ মানস সরোবর। এই রামায়ণ বাল্মীকির রামায়ণের ভাবানুবাদ নহে। বাল্মীকির রামায়ণের অধিকাংশ স্থলে রামচন্দ্র মনুষ্যরূপে কল্পিত হইয়াছেন, কিন্তু তুলসীদাসের রামচন্দ্র ঈশ্বরের অবতার—সাধারণ মনুষ্যমাত্র নহেন। "রাম কে?" এই প্রশ্ন লইয়াই 'রামচরিতমানস' আরম্ভ হইয়াছে। পার্ব্বতীর সহিত কথাপ্রসঙ্গে শিব বলিলেন, "গুণরহিত যিনি তিনিই সগুণ হ'ন—যেমন জল ও বরফ একই জিনিষ, ভিন্ন নয়। রামচন্দ্রই দৃষ্টিগোচর জগৎ, তিনিই জগতের প্রকাশক, তিনিই মায়াপতি, জ্ঞান ও গুণের আলয়। তিনি সত্য, মায়া অসত্য। কিন্তু তাঁহারই রচিত মোহবশে মিথ্যা মায়া সত্য বলিয়া বোধ হয়।······জগৎ রামচন্দ্রের আশ্রিত হইয়া আছে।······তাঁহার পা নাই তবুও তিনি চলেন, কান বিনাই শোনেন, হাত না থাকিলেও কাজ করেন, কথা না বলিলেও তিনি বড় বক্তা, শরীর না থাকিলেও স্পর্শ করেন, চোখ না থাকিলেও তিনি দেখেন, নাক না থাকিলেও তিনি গন্ধ লন। এমনি রকম সকল কার্য্য তাঁহার অলৌকিক, তাঁহার মহিমা বর্ণনা করা যায় না। ভক্তের মঙ্গলের জন্য সে অরূপ ভগবানই কোশলপতি রামচন্দ্র হইয়াছেন।" এইরূপে তুলসীদাস বুঝাইয়াছেন যে নরদেহধারী রামই নির্গুণ ব্রহ্ম। বিশ্বপতির নরদেহধারণের কারণ বুঝাইতে গিয়া তুলসীদাস বলিয়াছেন,

"ভগত হেতু ভগবান প্রভু রাম ধরেউ তনু ভূপ।
কিয়ে চরিত পাবন পরম প্রাকৃত-নর-অনুরূপ ॥
জথা অনেক বেষ ধরি নৃত্য করই নট কোই।
সোই সোই ভাব দেখাবই আপুন হোই ন সোই ॥"

"ভক্তের হিতের জন্যই ভগবান রাম-রাজার শরীর ধারণ করিয়াছিলেন। সাধারণ মানুষের মত, অথচ পরম পবিত্র চরিত্র তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু রামের মানুষ-রূপ সম্পূর্ণ নিজের রূপ নয়। কোনও নট যেমন নানাপ্রকার বেশ ধরিয়া নৃত্য করেন ও যে বেশ ধরিয়াছেন সেইরূপ ভাব দেখান, কিন্তু সে সকল ভাবের কোনটাই নটের নিজের নয়, ভগবানও তেমনি নটের মত, মানুষ হওয়ার নাটকে রাম সাজিয়াছিলেন।"

রামের সহিত রাবণের যুদ্ধের কাহিনী রামায়ণের বিষয়বস্তু। "রাবণ রাক্ষসদের রাজা। রাক্ষস কাহারা? যাহারা শুভ আচরণ করিতে দেয় না, দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু মানে না, যজ্ঞ পণ্ড করে, সংসার ভ্রষ্টাচারী করে, বেদ পুরাণের কথা বলিলে তাহাকে দেশছাড়া করিয়া তাড়াইয়া দেয়, তাহারাই রাক্ষস। সেই রাক্ষসদিগকে বধ করিবার জন্য দশরথ ও কৌশল্যার পুত্ররূপে বিশ্বপতি স্বয়ং নরজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তুলসীদাস জানিতেন, রামের অপূর্ব্ব লীলা আস্বাদনের শক্তি সকলের নাই, ঐকান্তিকী ভক্তি দ্বারা এই শক্তি অর্জ্জন করিতে হয়। তাই তিনি বলিয়াছেন, "এই কথা (অর্থাৎ রাম-কথা) দুষ্ট, জেদী লোক—যাহারা মন দিয়া হরিলীলা শুনে না—তাহাদিগকে

বলিবে না। একথা কামীকে, ক্রোধীকে ও যে জগৎপতিকে ভজনা করে না তাহাকে বলিবে না।” যে ভক্তির সহিত রাম-কথা শুনিবে না তুলসীদাসের অপূর্ব্ব কাব্য তাহার জন্য নয়।

তুলসীদাসের কাছে জগৎ ছিল রাম-ময়, তাই রামচরিত্র অঙ্কনে তিনি ভক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন ও শিল্পকৌশলের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। রামের বাল-রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, “তাহার পেটে ত্রিবলী রেখা, গভীর সুন্দর নাভি, চওড়া বুক। ঐ বীর শিশুর গায়ে ছেলেদের নানা অলঙ্কার শোভা পাইতেছিল। তাহার হাতের রঙ্ লাল, নখ ও অঙ্গুলিগুলি সুন্দর, বিশাল বাহুতে সুন্দর ভূষণ দেওয়া, কাঁধ বাল-কেশরীর মত, গ্রীবা শাঁখের মত, চিবুক সুন্দর, মুখের শোভার সীমা নাই। কল-বল করিয়া আধ আধ কথা বলে, তাহার ওষ্ঠ লাল্‌চে, দুটা দুটা করিয়া সুন্দর দাঁত, কপোল ও নাক সুন্দর, তাহার হাসি চাঁদের কিরণের ন্যায়। তাহার চোখ নীল পদ্মের মত, উহা সংসারবন্ধন মুক্ত করে। তাহার কপালে গোরচনার তিলক কাটা, ভ্রূ কান পর্য্যন্ত বড় ও সুন্দর, আর মাথায় কালো কোঁকড়া চুল।” যৌবনে এই সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়াছিল। যখন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ মিথিলার স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইলেন তখন সমবেত রাজগণকে অতিক্রম করিয়া সকলের দৃষ্টি তাঁহাদের উপর পড়িল: “রাজাদের মধ্যে কোশলের দুই রাজকুমার শোভা পাইতেছিলেন—একজনার দেহ

শ্যামল, অপরের দেহ গৌরবর্ণ। তাঁহারা বিশ্বের সকলের চক্ষু যেন চুরি করিয়া লইয়াছিলেন।”

তুলসীদাস বলিয়াছেন, রামচন্দ্র ছিলেন “সহজ-আনন্দ-নিধান” অর্থাৎ স্বভাবতঃই আনন্দময়। যখন কৈকেয়ী তাঁহাকে বনবাসের কথা শুনাইলেন তখন তিনি বলিলেন, “সেই পুত্রই বড় ভাগ্যবান, যে বাপমায়ের কথায় অনুরাগ দেখায়। পিতামাতাকে তুষ্ট করে এমন পুত্র সংসারে দুর্লভ।” রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াও তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন, “বনভূমি বিশেষ করিয়া মুনিদিগের মিলনের স্থান, সেখানে আমার সকল রকমেই হিত হইবে। তাহার উপর পিতার আজ্ঞা ; আবার মা, তোমার সম্মতি রহিয়াছে। প্রাণ-প্রিয় ভরত রাজ্য পাইবে। আজ দেখিতেছি বিধাতা সকল প্রকারেই প্রসন্ন। এমন কাজেও যদি বনে না যাই তবে আমাকে মূর্খের অগ্রগণ্য বলিতে হইবে। যে মূর্খ কল্পতরু ত্যাগ করিয়া ভেরাণ্ডার গাছ চায়, যে অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ চায়, সেও এমন অবসর পাইয়া সুযোগ ছাড়ে না।” তুলসীদাস মন্তব্য করিয়াছেন, “রঘুপতি যেন নূতন ধরা হাতী, আর রাজ্যপাট হইতেছে তাঁহার বাঁধনের দড়ি। ছুটি পাইয়াছেন, বনে যাইতে পারিবেন—ইহাতে তাঁহার মনে বড়ই আনন্দ !”

ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের সংগ্রাম উপস্থিত হইলে ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। রামের সহিত রাবণের মল্লযুদ্ধ হইতেছে। রাবণ রথারূঢ়, রামের রথ নাই। বিভীষণ রামকে বলিলেন,

"হে নাথ, তোমার রথ নাই, পায়ে পাদুকা নাই। বলবান বীর রাবণকে কি করিয়া জিতিবে?" রাম বলিলেন, "হে সখা, যাহাতে জয় হইবে এমন রথ আনিয়াছি। সে রথের চাকা শৌর্য্য ও বীর্য্য। তাহার ধ্বজা ও পতাকা সত্য ও শীল। এই রথের চতুর সারথি হইতেছে ঈশ্বর-ভজন, ঢাল হইতেছে বিরতি ও তলোয়ার হইতেছে সন্তোষ। কুঠার হইতেছে দান, বুদ্ধি হইতেছে শেল, ধনুক হইতেছে বিজ্ঞান। নির্ম্মল অচল মন হইতেছে তূণীর, সংযম নিয়ম নানাপ্রকার বাণ, ব্রাহ্মণ গুরুর পূজা অভেদ্য কবচ। ইহাদের সমান বিজয়ের অন্য উপায় আর নাই। এইরূপ ধর্ম্মময় রথ যাহার, তাহাকে জয় করার মত শত্রু কোথাও নাই।"

রাবণবধের পর রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিলেন, রাম-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। রাম-রাজ্যের স্বরূপ বর্ণনাপ্রসঙ্গে তুলসীদাস বলিয়াছেন, "রামরাজ্য বসিল, ত্রিলোক আনন্দিত হইল, সকল শোক গেল। কাহারও সহিত কেহ শত্রুতা করে না, রামের প্রতাপ ভেদ দূর করিয়া দিল। বর্ণাশ্রম অনুসারে সকলে বেদের পথে থাকিয়া নিজ নিজ ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিল। সকলে সর্ব্বদা সুখ পাইতে লাগিল; রোগ, শোক, ভয় রহিল না। দৈহিক, দৈবিক ও ভৌতিক, এই ত্রিতাপ রাম-রাজ্যে কাহারও রহিল না। সকলে পরস্পরের প্রতি ভালবাসার সম্পর্ক রাখিল, সকলে বেদ অনুসারে ধর্ম্মপালন করিতে লাগিল। জগতে চারিপদ পূর্ণ ধর্ম্ম স্থাপিত হইল, স্বপ্নেও

পাপ রহিল না। সকল নর-নারী রাম-ভক্তি-রত হইল, সকলেই পরম গতির অধিকারী হইল। অকালমৃত্যু রহিল না, সে ব্যথা কেহ পাইত না, সকলেরই সুন্দর নীরোগ শরীর হইল। না রহিল দরিদ্র, না রহিল দীন-দুঃখী। কেহ মূর্খ বা অলক্ষুণে রহিল না। সকলে নিরহঙ্কার ও ধর্ম্মরত হইল, সকল স্ত্রী ও পুরুষ গুণী হইল। সকলে গুণজ্ঞ পণ্ডিত ও জ্ঞানী হইল, সকলেই কৃতজ্ঞ হইল; কেহ কপটতা করিয়া চতুরতা করিবার রহিল না।"

রামের সহিত সীতার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তুলসীদাসের অঙ্কিত রাম-চরিত্রের ন্যায় সীতা-চরিত্রও গৌরবে ও মাধুর্য্যে অনুপম। তিনি সীতার রূপ বর্ণনা করেন নাই, বলিয়াছেন, "সীতার শোভা বর্ণনা করা যায় না, সীতা জগতের মাতৃস্বরূপা ও গুণের খনি। সকল উপমাই সাধারণ স্ত্রীলোকের বেলায় ব্যবহার হওয়ায় সেগুলি সীতার বেলায় আমার কাছে খাটো লাগে।" সাক্ষাৎভাবে বর্ণনা না করিলেও যেখানেই তুলসীদাস সীতার উল্লেখ করিয়াছেন সেইখানেই বিনয়, ভক্তি ও পবিত্রতার স্রোত বহাইয়া গিয়াছেন। রাবণবধের পর, রাম-সীতা অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। সীতা রাজরাণী হইলেন— কিন্তু তখনও তিনি দরিদ্র পরিবারের কল্যাণময়ী বধূর মত দিন যাপন করিতেন। তুলসীদাস বলিয়াছেন, "সীতা সর্ব্বদা পতির অনুকূল রহিলেন। সীতা শোভাময়ী, সুশীলা, বিনয়বতী। তিনি কৃপাসিন্ধু রঘুনাথের সামর্থ্য জানিতেন, মন দিয়া তাঁহার

চরণসেবা করিতেন। যদিও রাজ-বাড়ীতে খুব সেবা-কুশল দাস-দাসীর অভাব ছিল না তথাপি সীতা নিজ হাতেই গৃহ-পরিচর্য্যা করিতেন ও রামচন্দ্রের আদেশ অনুসরণ করিতেন। যাহাতে রামচন্দ্রের সুখ হয় সীতা তাহাই করিতেন, তিনি সেবা-বিধি জানিতেন। তিনি কৌশল্যাদি শাশুড়ীকে তাঁহাদের গৃহে সেবা করিতেন, তাঁহার অভিমান বা অহঙ্কার ছিল না। সীতা পার্ব্বতী-লক্ষ্মী-ব্রহ্মাদিরও বন্দনীয়া, তিনি জগতের মাতা এবং সদা প্রশংসনীয়া। লক্ষ্মীর স্বভাব চঞ্চল। সেই লক্ষ্মীরূপিণী সীতা, যাঁহার কৃপাদৃষ্টি দেবতারাও চায়, তিনি নিজের চঞ্চল স্বভাব খোয়াইয়া অচঞ্চল হইয়া রামচন্দ্রের পদে ভক্তি করিতেন।"

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের সেবায় আত্মবিলোপ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে তুলসীদাস কার্পণ্য করেন নাই; কিন্তু চরিত্র অঙ্কন কালে তিনি ভরতকে প্রাধান্য দিয়াছেন। 'রামচরিত মানসে'র পাঁচ ভাগের এক ভাগ ভরত-কথায় পূর্ণ। মাতুলালয় হইতে অযোধ্যা প্রত্যাগমনের পর নিজের রাজ্য-লাভের সংবাদ শুনিয়া ভরত কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "জগতে এমন প্রাণী কে আছে যাহার নিকট রঘুনাথ প্রাণপ্রিয় নয়? সেই রামও তোর অতি শত্রু হইল—তুই কে সত্য করিয়া বল্।" শোকাতুরা কৌশল্যার নিকট যাইয়া বলিলেন, "যে পাপ পিতা মাতা পুত্রকে মারিলে হয়, যে পাপ গাভী গোষ্ঠ ব্রাহ্মণপুরী জ্বালাইয়া দিলে হয়, সেই সকল পাতক

আমার হউক, বিধাতা তাহাই করুন—যদি, মা, আমার কৈকেয়ীর কার্য্যে সম্মতি থাকে।” মন্ত্রীরা যখন তাঁহাকে সিংহাসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন তখন ভরত তাঁহাদিগকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন “কৈকেয়ীর পুত্র, কুটিলমতি রাম-বিমুখ নির্লজ্জ আমার মত অধমের রাজ্যে যে তোমরা সুখ চাও সে কেবল মোহবশে।”

ভরত রামচন্দ্রের সন্ধানে চলিলেন—“এখন পথে পথে কেবল রামের যাওয়ার চিহ্ন পড়িয়া আছে। ভরত সে ঘাট, সে বাট, সে পথের ধূলায় প্রণাম করিতে করিতে চলিয়াছেন। গাছের তলায় যে শয্যায় রাম-সীতা রাত্রি কাটাইয়াছেন সেই কুশের সুন্দর শয্যা দেখিয়া ভরত প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন—পায়ের দাগ যেখানে আছে সে ধূলি চোখে লাগাইলেন—ভরতের প্রীতির কথা বর্ণনা করা যায় না। সীতার ভূষণের দুই চারিটা সোনার রেণু পড়িয়া আছে দেখিয়া উহা যেন স্বয়ং সীতা এই ভাবে মাথায় রাখিলেন। গঙ্গা পার হইলেন, ত্রিবেণী পার হইলেন, সকল স্থানেই প্রণাম করিয়া করিয়া একই বর চাহেন—অর্থে বা ধর্ম্মে বা কামে রুচি নাই, মোক্ষও চাই না। জন্মে জন্মে যেন রাম-পদে রতি থাকে—এই বর ছাড়া আর কিছু চাই না।”

অবশেষে রামচন্দ্রের সহিত ভরতের সাক্ষাৎ হইল; রামচন্দ্র তাঁহাকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইয়া প্রজাপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। রামচন্দ্র বলিলেন, “খাওয়া দাওয়ার

জন্য যেমন আছে মুখ, দেশের মুখ্যও এই মুখের মত হওয়া চাই। মুখ খায়, কিন্তু তাতেই সকল অঙ্গ পুষ্ট ও পালিত হয়; তেমনি মুখ্যও (রাজা) প্রজার নিকট হইতে নিজের খাদ্য (কর) লইয়া সকল অঙ্গের (সমগ্র রাজ্যের) পোষণ ও পালন করিবে। ইহাই রাজধর্ম্মের সার কথা।” রামচন্দ্রের পাদুকা লইয়া ভরত অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলেন—সেই পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করিয়া স্বয়ং অযোধ্যার উপকণ্ঠে নন্দীগ্রামে এক কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। তুলসীদাস বলিয়াছেন, “মাথায় জটা ধারণ করিয়া, মাটি খুঁড়িয়া তাহাতেই কুশের শয্যায় শুইয়া, অশন-বসন-ব্যসন-ব্রত-নিয়ম বিষয়ে ঋষিদিগের কঠিন ধর্ম্ম প্রেমের সহিত তিনি পালন করিতে লাগিলেন। ভরতের ব্রত-নিয়মের কথা শুনিয়া সাধুদেরও সঙ্কোচ হয়, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মুনিরাজেরাও লজ্জা পান। ভরতের চরিত পাপরূপ হাতীর পক্ষে সিংহের ন্যায়। উহা সকল সন্তাপ-শান্তকারী, জনরঞ্জনকারী, ভব-ভার-ভঞ্জন-কারী। উহা রামভক্তিরূপ সুধার সার।”

তুলসীদাস কেবল যে চরিত্র অঙ্কনে ও ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যানে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা নহে। প্রাকৃতিক শোভার বর্ণনায় তাঁহার কবিত্বশক্তি সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। পম্পা সরোবরের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, “পম্পা সরোবরের জল সাধুর হৃদয়ের মতই নির্ম্মল। তাহাতে চারিটা মনোহর ঘাট। যেখানে সেখানে নানা পশুরা জলপান করিতেছিল,

মনে হয় কোন দানশীল লোকের বাড়ীতে যাচকদের ভিড় হইয়াছে। যেমন মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ায় নির্গুণ ব্রহ্ম দেখা যায় না, তেমনি ঘন কুমুদের পাতায় জল ঢাকা ছিল বলিয়া জলের মর্ম্ম বুঝা যাইতেছিল না। যেমন ধর্ম্মশীল লোকের দিন সুখে কাটে, তেমনি অতি অগাধ জলে মাছেরা একটানা সুখী হইয়াছিল। নানা রঙের পদ্ম ফুটিয়াছিল। ভোমরারা মিষ্টস্বরে গুঞ্জন করিতেছিল। জলচর মোরগ ও হাঁসেরা সুন্দর ডাকিতেছিল, যেন প্রভুকে (রামকে) দেখিয়া প্রশংসা করিতেছিল। চক্রবাক, বক প্রভৃতি পাখীদিগকে কেবল দেখাই চলে, উহাদের বর্ণনা আর করা যায় না। সুন্দর পাখীরা তাহাদের সুন্দর ভাষায় যেন পথিকদিগকে ডাকিয়া লইতে চায়। সরোবরের নিকট মুনিদিগের আশ্রম। আর চারিদিকে বন ও গাছের শোভা—চাঁপা, বকুল, কদম্ব, তমাল, পাটল, কাঁঠাল, পলাশ ও আম। নানা গাছে নূতন পাতা হইয়াছিল ও ফুল ফুটিয়াছিল, ভোমরার দল গুণ গুণ করিতেছিল। স্বভাবতঃই সর্ব্বদা শীতল, মন্দ, সুগন্ধ ও সুন্দর বাতাস বহিতেছিল। কোকিলেরা কুহু কুহু ডাকিতেছিল। গাছগুলি ফলের ভারে মাটি ছুঁইয়াছিল, যেমন পরোপকারী লোক সুন্দর সম্পত্তি পাইয়া অবনত হয় তেমনি।"

সীতাহরণের পর চিত্রকূট পর্ব্বতে বর্ষা আসিল। তুলসীদাস বলিয়াছেন, "বর্ষাকালে মেঘ আকাশ ছাইয়া গর্জ্জন করিত, রামের উহা বড় ভাল লাগিত। রামচন্দ্র বলিলেন—হে লক্ষ্মণ,

দেখ। ময়ূরেরা মেঘ দেখিয়া নাচিতেছে। বৈরাগ্যব্রত পালন-কারী গৃহীর বিষ্ণুভক্তকে দেখিয়া যেমন অবস্থা হয়, ময়ূরগুলিরও মেঘ দেখিয়া সেই অবস্থা হইয়াছে। আকাশে মেঘ ঘর্ঘর গর্জ্জন করিতেছে। বিদ্যুৎ চমকাইয়া মেঘের ভিতরেই থাকিয়া যাইতেছে না, খলের প্রীতির মতই উহা অস্থির। পণ্ডিত বিদ্যা পাইলে যেমন অবনত হয়, মেঘ তেমনি করিয়া মাটির নিকট নামিয়া আসিয়া (নত হইয়া) জলবর্ষণ করিতেছে। সাধু যেমন করিয়া খলের কথা সহ্য করে, পর্ব্বত তেমনি করিয়া বৃষ্টির আঘাত সহ্য করিতেছে। ক্ষুদ্র নদী ভরিয়া উপচাইয়া চলিয়াছে, যেমন অল্প ধন হইলে খল উন্মত্ত হইয়া যায় তেমনি। জীব যেমন মায়ায় জড়াইয়া মলিন হইয়া যায়, তেমনি জল মাটিতে পড়িতেই ঘোলা হইয়া যাইতেছে। বৃষ্টির জল একত্র হইয়া পুকুর ভরিয়া ফেলিতেছে, যেমন করিয়া সদ্‌গুণ একে একে সজ্জনের কাছে আসে তেমনি। নদীর জল সমুদ্রে যাইতেছে। হরিকে পাইলে ভক্ত যেমন নিশ্চল হয়, নদী সমুদ্রে পড়িয়া তেমনি নিশ্চল হইতেছে। ঘাসে ছাইয়া ফেলায় মাটি সবুজ হইয়া গিয়াছে, পথ আর দেখা যায় না। ভণ্ডদিগের তর্কে সদ্‌গ্রন্থ যেমন লুপ্ত হয়, ঘাসে তেমনি পথ লুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। চারিদিকে ভেকের সুন্দর ডাক উঠিয়াছে, যেন ব্রাহ্মণেরা বেদ পড়িতেছে। সাধকের মনে যেমন জ্ঞান বিকশিত হয়, তেমনি অনেক গাছে নূতন পাতার বিকাশ হইয়াছে। ক্রোধ যেমন ধর্ম্মকে দূর করে, বর্ষাকাল তেমনি ধূলা দূর করিয়াছে।

পরোপকারী মানুষের সম্পত্তি যেমন শোভা পায়, শস্যপূর্ণ হইয়া পৃথিবী তেমনি শোভা পাইতেছিল। রাত্রির ঘন অন্ধকারে জোনাকি দেখা দেওয়ায় মনে হইল যেন দম্ভকারীদের দল একত্র হইয়াছে। কখনও প্রবল বায়ু বহিতে.ছল। যেমন করিয়া কুপুত্র কুলে উৎপন্ন হইয়া সম্পত্তি ও ধর্ম্ম নাশ করে, তেমনি করিয়া বায়ু মেঘকে যেখানে সেখানে ছিন্নভিন্ন করিতেছিল। কখনও বা দিনের বেলাতেই ঘন অন্ধকার হইতেছিল, কখনও বা সূর্য্য দেখা দিতেছিল। যেমন সুসঙ্গ ও কুসঙ্গ পাইয়া জ্ঞান জন্মে ও নষ্ট হয়, তেমনি করিয়া আলো ও অন্ধকার হইতেছিল। রাম বলিলেন—হে লক্ষ্মণ, দেখ। বর্ষা গেল। পরম সুন্দর শরৎ ঋতু আসিল। কাশের ফুল সকল পৃথিবী ছাইয়া ফেলিল। বর্ষা ঋতু যে বুড়া হইয়াছে, কাশের ফুল তাহাই যেন প্রকাশ করিয়া দিল।”

তুলসীদাসের ন্যায় ভক্ত কবি ভারতবর্ষেও আর জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। সমগ্র কাব্যের এমন শুচিসুন্দর আবেষ্টনী আর কাহারও রচনায় দেখা যায় না। উপরে উদ্ধৃত উপমাগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে—সৌন্দর্য্য ও রসের সঙ্গে কিরূপ ধর্ম্ম ও নীতির সম্মেলন ঘটিয়াছে। অন্যান্য কবিরা সাধারণতঃ ভাব বুঝাইতে প্রাকৃত বা বাস্তব জগৎ হইতে উপমা নির্ব্বাচন করেন, তুলসীদাসের পদ্ধতি অন্যরূপ। তিনি বাস্তব দৃশ্য ও প্রাকৃত বস্তুর পরিচয় দিতে ভাব জগৎ হইতে উপমা নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

বিশ্বজননী সীতাদেবীকে রাক্ষসে হরণ করিয়া লইয়া যাইবে —তুলসীদাস বাল্মীকির এই কথাবস্তু সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—রাবণ ছায়াসীতা হরণ করিয়াছিল, প্রকৃত সীতা অগ্নির আশ্রয়ে রহিয়া গেলেন। অগ্নিপরীক্ষার সময় ছায়াসীতার স্থলে প্রকৃত সীতা বাহির হইয়া আসিলেন। সাতামাইয়ের নামে কলঙ্ক আরোপও তুলসীদাস সহ্য করিতে পারেন নাই। তাই তুলসীদাসের রামায়ণে সীতা নির্ব্বাসন নাই। একনিষ্ঠ পরম ভক্তের রামায়ণ যেরূপ হওয়া উচিত, তুসীদাসের রামায়ণ তাহাই।

রবীন্দ্রনাথ

"জগৎ কবি সভায় মোরা তোমার করি গর্ব্ব ;
বাঙ্গালী আজি গানের রাজা বাঙ্গালী নহে খর্ব্ব।"

এ কথা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। জগতের কবিসভায় রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট আসন নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মত বহুমুখী প্রতিভার কবি জগতের সাহিত্যে বিরল। ইংরাজী সাহিত্যে সেক্সপীয়ারের প্রতিভা ছিল বহুমুখী, ফরাসী সাহিত্যে ভিক্টর হুগোর প্রতিভা ছিল বহুমুখী, জার্ম্মান সাহিত্যে গেটের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। ইঁহাদের প্রতিভা যদি হয় শতমুখী, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তবে সহস্রমুখী। ইংরাজী সাহিত্যে সেক্সপীয়ারেব যে স্থান, ফরাসী সাহিত্যে ভিক্টর হুগোর যে স্থান, জার্ম্মান সাহিত্যে গেটের যে স্থান,—ভারতীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সেই স্থান। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের বহু শত বৎসরের তপস্যার ফল। রবীন্দ্রনাথকে পাইয়া বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী সমগ্র জগতের কাছে গৌরবান্বিত।

রবীন্দ্র-কাব্যের ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুরক্ত পাঠক শুধু বাঙ্গালায় নয়, সমগ্র বিশ্বে অসংখ্য। জগতের সকল স্থানেই কবির অগণিত ভক্ত আছে। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাড়ুইর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন,

"বুদাপেষ্ট শহরের কথা আমার মনে পড়ে। একদিন একটি হাসপাতালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাকে ভারতীয় দেখে অনেক রোগীই তাদের বালিশের নীচ থেকে হাঙ্গেরীয় ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কাব্য-নাটকের খণ্ড বা'র করে দেখিয়ে বলেছিল,—আমরা টেগোরের গ্রন্থ শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়ি। এ আমাদের দুঃখে সান্ত্বনা, রোগযন্ত্রণায় স্বস্তি এনে দেয়।" শ্রীযুক্তা নাইডু আরও বলিয়াছেন, "একসময়ে সুইডেনে শীতঋতু যাপন করি। সেখানেও সকলে আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের কথা শুনতে চাইত। নরওয়ে ভ্রমণকালে লক্ষ্য করেছিলাম যে, সেখানকার তুষারাস্তীর্ণ পর্ব্বতগাত্রে কৃষক-দিগের পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নিরালা আবাসে কুয়াসামলিন শীত-ঋতুতে কৃষক পরিবার রবীন্দ্রনাথের কাব্য অথবা নাটক পাঠ করছে আগুনের চারিদিকে বসে। এ ছাড়া ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইটালী—যখনই যেখানে গিয়েছি সেখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা দেখেছি। পূর্ব্ব আফ্রিকার অসভ্য জাতিরাও জানে যে রবীন্দ্রনাথ নামে একজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি আছেন।"

বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথের মত জীবৎকালে এত মর্য্যাদা পৃথিবীর আর কোন কবি লাভ করেন নাই। তাঁহার এই মর্য্যাদায় বাঙ্গালার, তথা ভারতের মর্য্যাদা বিশ্বের কাছে বহুগুণে বাড়িয়াছে। একথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় যেজগতে কোন সম্রাট্, কোন রাষ্ট্রনেতা, কোন পণ্ডিত, কোন

সাহিত্যিক বা কোন দিগ্‌বিজয়ী বীর জীবদ্দশায় তাঁহার মত এমন মর্য্যাদা লাভ করেন নাই।

কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার জন্ম হয় ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ তারিখে।

ঠাকুর পরিবার জ্ঞানে, বিত্তায়, অর্থে, চরিত্রবৈশিষ্ট্যে ও সর্ব্বাঙ্গীন সংস্কৃতিতে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ধর্ম্ম ও কর্ম্মে, ত্যাগ ও ভোগে, কলায় ও বিত্তায় ঠাকুর পরিবারের সবিশেষ খ্যাতি ছিল। এই পরিবারের আবেষ্টনী একটি বিশ্ববিত্তালয়ের মত। এই বিশ্ববিত্তালয়েই কবির বাল্য কৈশোরের শিক্ষা।

বিত্তালয়ের জীবন রবীন্দ্রনাথের কাছে দুঃসহ ছিল। সেখানকার প্রাচীরের কারা মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত তাঁহার কল্পনাপ্রবণ স্বাধীন কবিমানসকে পীড়িত করিত। সেইজন্য স্কুল-কলেজে তাঁহার মন বসিত না। স্কুল-কলেজের শিক্ষা তাঁহাকে আকৃষ্ট করে নাই। কিন্তু শিক্ষার প্রতি তিনি কোনদিনই উদাসীন ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ নিজের শিক্ষার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করিয়া বাড়ীতে অতি অল্প বয়সেই রাশি রাশি বাঙ্গালা, ইংরেজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন মুখে মুখে কবিতা আবৃত্তি, নাট্যাভিনয়, কাব্য ও সাহিত্যের সমালোচনা প্রভৃতি তাঁহাদের বাড়ীতে প্রায়ই হইত। এই বাড়ীর চারিপাশে ছিল শিল্পসাহিত্যের পরিবেষ্টনী। সেই পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোর

অতিবাহিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী জীবনেও নানা উপায়ে নানা দিক হইতে তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইয়াছিল। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞানানুশীলন কিছুমাত্র কমে নাই। বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ না করিলেও তাঁহার মত বহুবিদ্য ব্যক্তি জগতের যে কোন দেশে বিরল ছিল।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষালাভের বিশিষ্টতাও লক্ষণীয়। তিনি জ্ঞান আহরণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি তাঁহার অধীত বিদ্যাকে বাণীরূপ দান করিয়া কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে, গল্প ও প্রবন্ধের মধ্য দিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। তাঁহার সকল রচনাই মার্জ্জিত বুদ্ধির দীপ্তিতে ভাস্বর এবং অসামান্য সৌন্দর্য্যবোধের রসে শুচিশ্রীসম্পন্ন।

রবীন্দ্রনাথ ধনী পরিবারে জন্মিয়াছিলেন। সেকালে ধনী বলিয়া ঠাকুর পরিবারের খ্যাতি সমস্ত বঙ্গদেশে পরিব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু তবু এ পরিবারের ছেলেদের চালচলনে কোনরূপ ধনগর্ব্ব একদিনের জন্যও ফুটিয়া উঠে নাই। সেইজন্য দেখা যায় যে, সরল, অনাড়ম্বর ভাবে রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। রেড়ির তেলের আলোতে রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার বালক বয়সে পড়িতে হইত। বিজলি বাতি ত দূরের কথা, কেরোসিনের বাতিও তাঁহার অদৃষ্টে জুটে নাই। আহারে তাঁহার বিলাসিতার নামগন্ধও ছিল না। তাঁহার পরিধেয় বেশভূষা ছিল সাধারণ ধরণের। বয়স দশের কোঠা পার হইবার আগে রবীন্দ্রনাথ কোন কারণেই মোজা পরিতে পান

নাই। তাঁহাকে সারা বৎসর সাদা জামা পরিধান করিতে হইত। বালক রবীন্দ্রনাথকে শীতকালে দু'টি মাত্র সাদা জামা গায়ে দিয়া কাটাইতে হইত। শীত বলিয়াই দুইটি। গরমের দিনে একটি সাদা জামাই কবির পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ছেলেবেলায় তিনি বাড়ীতে পরিবার জন্য মাত্র একজোড়া চটি পাইতেন ; কিন্তু সে চটিও দীর্ঘকালের পুরানো।

ঠাকুর পরিবারে ছেলেদের প্রতি বেশী দৃষ্টিপাত করিবার বালাই ছিল না। ছেলেদের দেখাশোনার ভার ছিল ভৃত্যদের উপরে। সেইজন্য তাহাদের শৈশব ও বাল্যকাল অতিবাহিত হইত ভৃত্যদের মহলে। চাকরদের শাসন ছিল কঠোর। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে বলিয়াছেন "ভৃত্যতন্ত্রশাসন"।

শ্যাম নামে একটি চাকরের উপর রবীন্দ্রনাথের দেখাশোনার ভার ছিল। এই চাকরটি ছিল কিছু আরামপ্রিয় আর চতুর। পাছে বালক রবীন্দ্রনাথ তাহার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাইয়া তাহাকে উদ্ব্যস্ত করেন সেজন্য সে এক অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাঁহাকে এক জায়গায় আটকাইয়া বন্দী করিয়া রাখিত। রবীন্দ্রনাথকে সে ঘরের একটা নির্দ্দিষ্ট কোণে বসাইয়া তাঁহার চারিদিকে খড়ি দিয়া গণ্ডী কাটিয়া দিত। তাহার পর গম্ভীর মুখ করিয়া বালককে সাবধান করিয়া বলিত, "এই গণ্ডীর ভিতর ব'সে থাক। খবরদার, বাইরে এসো না। গণ্ডীর বাইরে এলেই বিপদ।" বিপদটা কি, তাহা বালক রবীন্দ্রনাথ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। কিন্তু তবু

তাঁহার মনে বড় আশঙ্কা হইত। গণ্ডী পার হইয়া সীতা দেবীর কি সর্ব্বনাশ হইয়াছিল তাহা তিনি রামায়ণে পড়িয়াছিলেন। তাই তিনি ভাবিতেন যে গণ্ডীটাকে অগ্রাহ্য করিলে হয়ত রাবণের মত কেহ আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। এই আশঙ্কায় তিনি গণ্ডীটাকে অগ্রাহ্য করিয়া উহার বাহির হইতে পারিতেন না। যতক্ষণ শ্যাম আসিয়া তাঁহাকে বাহিরে না আনিত, ততক্ষণ ভয়ে চুপ করিয়া তিনি ঐ গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া জানালার বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতির শোভা দেখিতেন।

জানালার নীচেই একটি পুকুর ছিল। পুকুরে লোকেরা স্নান করিতে আসিত, হাঁসেরা সাঁতার কাটিত, নারিকেল গাছগুলি তাহাদের পাতার ঝালর দোলাইত। এই দৃশ্য কবির কল্পনাকে দোলা দিয়া যাইত, বিশ্ব-প্রকৃতির রহস্য ও সৌন্দর্য্যের ঘটা কবিকে তন্ময় করিয়া তুলিত। শ্যামের দেওয়া গণ্ডীটাকে উপেক্ষা করিয়া বালক রবীন্দ্রনাথের বাহিরে যাওয়ার উপায় ছিল না বটে, কিন্তু বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতির রূপশ্রী দরজা-জানালার কাচ ভেদ করিয়া কবিকে স্পর্শ করিত। তাঁহার ইচ্ছা হইত গৃহের বন্দিশালা হইতে অনন্ত-প্রসারিত বহির্জগতে ছুটিয়া বাহির হইতে। কিন্তু বাহির হওয়ার উপায় ছিল না বলিয়াই তিনি প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য্য নির্নিমেষ নেত্রে দেখিতেন, আর কল্পনার রঙে তাঁহার পিপাসু মন রঙীন হইয়া উঠিত। এইরূপে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত

পরিচয়ের মধ্য দিয়াই রবীন্দ্রনাথের চিত্তে কবিপ্রতিভা অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

বিশ্বপ্রকৃতির সহিত পরিচয়ের নিবিড়তা এবং পারিবারিক প্রভাব—এই দুইয়ে মিলিয়া রবীন্দ্রনাথের চিত্তে কবিত্বের উন্মেষ ঘটাইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজেরা, তাঁহার পিতা এবং পরিবারের সকলেই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কাব্যের প্রতিও তাঁহাদের অনুরাগ ছিল অসীম। ইঁহাদের বাড়ীতে সর্ব্বদা কাব্যপাঠ ও কাব্যালোচনা হইত, সঙ্গীতচর্চ্চা হইত। বালক রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেন, বাড়ীর সকলের দেখাদেখি কবিতা রচনা করিতেও চেষ্টা করিতেন।

কবি যখন বালক, তখন তাঁহার বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতা রচনা করিতেন। বড়দাদার লেখনীমুখে তখন একেবারে শ্রাবণের প্লাবন—নব নব অশ্রান্ত তরঙ্গের কলোচ্ছ্বাসে কূল-উপকূল মুখরিত হইয়া উঠিত। বালক রবীন্দ্রনাথ সব সময় সেই সব কবিতার অর্থ ঠিক বুঝিতে পারিতেন না। কিন্তু সেই সাহিত্যরসস্রোতে মনের সাধ মিটাইয়া সন্তরণ করিতেন, তাহারই আনন্দ-আঘাতে কবির শিরা উপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত।

বালক রবীন্দ্রনাথকে প্রথম কবিতা লিখিতে শিখান তাঁহার এক ভাগিনেয়। ইনি কবির চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন—ইঁহার নাম জ্যোতিঃপ্রকাশ। জ্যোতিঃপ্রকাশের কাছে কবিতা রচনার প্রথম পাঠ শিখিয়া ইনি বাড়ীর অন্যান্য সকলের মত

কাবতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কবি তাঁহার কবিতা রচনার প্রথম উৎসাহ সম্বন্ধে নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন, "হরিণ শিশুর শিঙ্ বাহির হইবার সময়ে সে যেমন যেখানে-সেখানে গুঁতা মারিয়া বেড়ায়, নূতন কাব্যোদ্গম লইয়া আমিও সেই রকম উৎপাত আরম্ভ করিলাম।" হাতের কাছে কাগজের টুকরা পাইলেই বালক রবীন্দ্রনাথ তাহাতে কবিতা রচনা করিয়া বসিতেন।

ইহার পর বাড়ীর এক কর্ম্মচারীর নিকট হইতে তিনি একখানি নীল কাগজের খাতা চাহিয়া লইয়া তাহাতে বহু কবিতা রচনা করিয়া খাতাখানি ভরিয়া ফেলিয়াছিলেন। তখন কবির বয়স মাত্র আট বৎসর। কবির বয়স যখন ১৪ বৎসর (১২৮২ সাল) তখন 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামক একখানি সাময়িক পত্রিকায় 'বনফুল' নামে তাঁহার প্রথম কাব্য প্রকাশিত হয়। ইহার পরে ১২৮৪ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'ভারতী' নামক বিখ্যাত পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন। 'ভারতী' প্রকাশের প্রথম বৎসর হইতেই ঐ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস, সমালোচনা প্রভৃতি প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রথম বৎসরের 'ভারতী' কবির বহু রচনায় সমৃদ্ধ হইয়াছিল—কবির বয়স তখন মাত্র ১৬ বৎসর। ঐই বয়সেই তিনি 'কবিকাহিনী', 'ভগ্নহৃদয়' ও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' নামক কাব্যগুলি রচনা করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার প্রতিভা-নির্ঝরিণী শতদিকে শতমুখে প্রবাহিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা নব নব উন্মেষশালিনী। কবিতা, গান, নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রহসন, প্রবন্ধ, সমালোচনা—যেদিকেই কবি তাঁহার প্রতিভাজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়াছেন, সেই দিকটিই সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। কবি-কল্পনাকে তিনি নিত্য নব নব বাণীরূপ দান করিয়াছেন—তিনি নিজের সৃষ্টিকে নিজেই অতিক্রম করিয়া নূতন রূপ সৃষ্টি করিতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্তও বিরত হন নাই। কবি নব নব ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন—তাঁহার বাগ্-বৈভবে ও প্রকাশভঙ্গিমায় বাঙ্গালা সাহিত্য সুসমৃদ্ধ হইয়াছে।

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' নামক কাব্য রবীন্দ্রনাথের কুড়ি বৎসর বয়সের রচনা। অতঃপর 'প্রভাতসঙ্গীত' নামক কবির বিখ্যাত কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাঁহার বাইশ বৎসর বয়সে। এই কাব্যে কবি আপন প্রতিভা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত কবির তখনও নিবিড় ও পরিপূর্ণ পরিচয় লাভ হয় নাই। তাই 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' একটা বিষাদের সুর ধ্বনিত হইয়াছে—প্রকৃতির পরিচয় লাভ করিতে না পারায় কবির প্রাণ এই কাব্যে কাঁদিয়া উঠিয়াছে। 'প্রভাতসঙ্গীতে' বিশ্বপ্রকৃতির সহিত কবির নিবিড় পরিচয় ঘটিয়াছে। এই কাব্যে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত কবির মিলনের আনন্দই অভিব্যক্ত হইয়াছে। 'প্রভাত সঙ্গীতে'র বহু কবিতায় দেখি যে কবির প্রতিভা যেন অকস্মাৎ উৎসারিত হইয়া গলিয়া বহিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাই কবি গাহিয়াছেন—

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি';
জগৎ আসি' সেথা করিছে কোলাকুলি।"

অকস্মাৎ অসীম বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উপলব্ধি করিয়া কবির উল্লাস প্রকাশিত হইয়াছে।

'প্রভাত সঙ্গীত' রচনার পর হইতে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্য্যন্ত যত কাব্য রচনা করিয়াছেন সে সকলের মধ্যে কবির কল্পনা স্বাভাবিক ভাবেই আপন পথ করিয়া লইয়া দিকে দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। 'ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি', 'কথা', 'কাহিনী', 'কল্পনা', 'কণিকা', 'ক্ষণিকা', 'নৈবেদ্য', 'শিশু', 'উৎসর্গ', 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'বলাকা', 'পূরবী', 'মহুয়া', 'বনবাণী', 'পুনশ্চ', 'পরিশেষ' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। প্রত্যেক কাব্যে কবি রবীন্দ্রনাথের কল্পনা ও চিন্তাধারার একটি বিশিষ্টতা দেখা যায়। সংক্ষেপে রবীন্দ্র-কাব্যের কয়েকখানির ভাব ও কল্পনা-বিলাস এখানে বিশ্লেষিত হইল।

'কড়ি ও কোমলে' রবীন্দ্রনাথের রচিত বহু সনেট বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা আছে। রবীন্দ্রনাথের সনেটের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন বলিয়া গিয়াছেন—

"হে রবীন্দ্র, তোমার ও সুন্দর সনেট
কী সরস!"

'কড়ি ও কোমলে' প্রকৃতি তাহার রূপ-রস-বর্ণ-স্পর্শ-গন্ধ লইয়া এবং মানুষ তাহার বুদ্ধি-মন-স্নেহ-প্রেম লইয়া কবিকে

মুগ্ধ করিয়াছে এবং এই ধরণীকে পরম উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। সেইজন্য কবি বলিয়াছেন—

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

কবির কাছে বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানব দুইই সমান প্রিয়! শিশু সম্বন্ধে কবিতা রচনায় যে কৃতিত্ব কবি পরজীবনে প্রকাশ করিয়াছেন তাহার অঙ্কুর দেখিতে পাওয়া যায় 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে। কবির স্বদেশপ্রেমের প্রথম উন্মেষও এই কাব্যে। এই হিসাবে কাব্যখানি রবীন্দ্র-সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

'কড়ি ও কোমলে'র পর রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যখানি প্রকাশিত হয়। 'মানসী'তে কবির বিচিত্র রচনাভঙ্গী লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই কাব্যে কবির প্রতিভা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, কবির চিন্তাশক্তি সুপরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহাতে তিনি স্বদেশের সংস্কৃতিধারাকে অপূর্ব্ব বাণীরূপ দান করিয়াছেন। 'মানসী'র অপর বিশিষ্টতা ইহার ছন্দোবৈচিত্র্য।

'মানসী'র পরে 'সোনার তরী'। রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যে 'সোনার তরী' একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই কাব্যের প্রথম কবিতা 'সোনার তরী'—সেই অনুসারেই কাব্যের নামকরণ হইয়াছে। এই কাব্যের প্রায় প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে কবির সৌন্দর্য্যানুভূতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

ইহার কবিতাগুলি কল্পনার গভীরতায়, ভাষার পারিপাট্যে ও ছন্দোবৈচিত্র্যে অপূর্ব্ব। 'সোনার তরী'র পরে কবি 'চিত্রা' ও 'চৈতালি' কাব্য রচনা করিয়াছেন। এই সকল কাব্যে কবির প্রতিভা ক্রমশঃ পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়াছে।

'চৈতালি'র পর 'কথা' এবং 'কাহিনী' নামক কাব্য দুইখানি প্রকাশিত হয়। এই দুইখানি কাব্যের প্রায় সকল আখ্যায়িকার মূলে আছে ভারতীয় আধ্যাত্মিক আদর্শ। বৌদ্ধ, শিখ, মহারাষ্ট্র ও রাজপুত জীবনের এবং বাঙ্গালার সামাজিক জীবনের ত্যাগের কাহিনী অবলম্বন করিয়া অধিকাংশ কবিতা রচিত হইয়াছে। এইজন্য 'কথা' ও 'কাহিনী'র প্রত্যেকটি কবিতার মধ্য দিয়া এক একটি মহান্ আদর্শ অথবা আত্মত্যাগের উজ্জ্বল নিদর্শন রসরূপ লাভ করিয়াছে।

'কথা' ও 'কাহিনী' রচনার কয়েক বৎসর পরেই রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' কাব্যখানি প্রকাশিত হয়। 'সন্ধ্যা সঙ্গীতে' কবি তাঁহার প্রতিভার সন্ধান পাইয়াছিলেন। 'ক্ষণিকা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজস্ব ভাষার সন্ধান পাইয়াছেন এবং ছন্দের উপর তাঁহার অসাধারণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গীতি-কবিতার রসসৃষ্টির উপাদান—ছন্দ, সহজ ভাষা ও অলঙ্কার। 'ক্ষণিকা' কাব্যের প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে এসকলের চূড়ান্ত উৎকর্ষ দেখা যায়। ভাষার মধুরতায়, ছন্দোঝঙ্কারে ও অলঙ্কারের চাতুর্য্যে 'ক্ষণিকা'র প্রত্যেকটি কবিতাই কবির অনবদ্য, অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

'ক্ষণিকা'র পরেই 'নৈবেদ্য'। 'নৈবেদ্য' কবির এক অভিনব সৃষ্টি। 'নৈবেদ্যে'র প্রায় সকল কবিতাতেই আধ্যাত্মিক ভাব বর্ত্তমান। এই কাব্যে সাধক রবীন্দ্রনাথ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন পূর্ণ মনুষ্যত্ব—নিজের জন্য ও স্বদেশবাসীর জন্য। সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে ও ধর্ম্মের পথে চলিতে গেলে অশেষ দুঃখ হয়ত আমাদিগকে পাইতে হইবে—কবি ইহা জানেন। অথচ সেই সত্য, ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রতি কবির গভীর অনুরক্তি। সেইজন্য তিনি দুঃখ বরণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া দুঃখ বহন করিবার শক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন পরমেশ্বরের নিকট।

রবীন্দ্রনাথের শিশুসম্বন্ধীয় কবিতারচনার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার এই দিকটি চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে 'শিশু' কাব্যে। 'শিশু'র কবিতাসমূহ কল্পনাপ্রবণ শিশুহৃদয়ের আলেখ্য। কবি শিশু-চিত্তের অন্তর্নিহিত রহস্য সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়া তাহাকে সরসসুন্দর করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এই কাব্যে। নিজে শিশুভাবে আবিষ্ট হইয়া শিশুর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া এরূপ চমৎকার কাব্য জগতে আর কোন কবিই রচনা করেন নাই।

পৃথিবীতে এক শ্রেণীর কাব্য আছে যাহা কোনও বিশেষ দেশের বা কালের নহে। সেই সকল কবিতা সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌম, স্থান-কালকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে তাহাদের সমাদর। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' এই শ্রেণীর কাব্য।

এই কাব্যের সার্ব্বজনীনতা (universalism) উপলব্ধি করিয়া পাশ্চাত্ত্য জগৎ মুগ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথকে নোবেল প্রাইজ দান করিয়াছিল। এই 'গীতাঞ্জলি' পুস্তকের দ্বারাই সমগ্র ইউরোপে রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। 'গীতাঞ্জলি'র কবিতাগুলির মধ্যে একদিকে আছে কবির আধ্যাত্মিক সাধনার বিকাশ, অপরদিকে আছে দেশের দুর্দ্দশায় বেদনাবোধ।

'গীতাঞ্জলি'র পরে 'বলাকা'। নানাদিক হইতে 'বলাকা' কাব্য রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের অন্যতম। ইহার ছন্দের মধ্যে নূতনত্ব আছে, ইহার ভাবও অভিনব।

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল কাব্যের মধ্যেই একটা গতির আবেগ দেখিতে পাওয়া যায়। কবি ক্রমাগত যাত্রা করিয়া চলিতে চাহিয়া উদাত্ত কণ্ঠে গাহিয়াছেন—

"যাত্রী আমি ওরে,
পারবে না কেউ রাখতে আমায় ধ'রে।"

কবি বলিতে চাহিয়াছেন—স্থাণুত্বই স্থবিরতা—এমন কি মৃত্যু ; গতিই জীবন। গতির গীতিই জীবনের গীতি—যৌবনের গীতি।

'বলাকা'র প্রত্যেক কবিতায় এই গতির প্রবাহ খুব সুস্পষ্ট। ইহার প্রত্যেকটি কবিতা 'অকারণ অবারণ চলা'র আহ্বানে উদ্গত। কবি আকৈশোর অনুভব করিয়াছেন যে গতির মধ্য দিয়াই বিশ্বের প্রাণশক্তি বিকাশ পায়। সেইজন্য কবি ক্রমাগত সীমার বন্ধন হইতে অসীমের দিকে যাত্রা করিয়া চলিয়াছেন

এবং তিনি তাঁহার দেশবাসীদিগকেও ক্রমাগত যাত্রা করিয়া চলিবার আহ্বান জানাইয়াছেন। কবি জানেন যে গতি স্থগিত হইলেই আবিলতা ও আবর্জ্জনা জমিবে—মৃত্যু উপস্থিত হইবে। সেইজন্য তিনি বলিয়াছেন—

"আমরা চলি সমুখ পানে কে আমাদের বাঁধ্‌বে ?
রৈল যারা পিছুর টানে কাঁদবে তারা কাঁদবে !"

কবি জানেন পরিবর্ত্তনের দ্বারা মন নবনবায়িত হয়, যৌবন স্থায়িত্ব লাভ করে। কবি ইহা উপলব্ধি করিয়া গাহিয়াছেন—

"পুণ্য হই সে চলার স্নানে,
চলার অমৃতপানে
নদীর যৌবন
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ।"

গতিশীলতার এই গান ছন্দোলালিত্যে ও শব্দৈশ্বর্য্যে বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যে এক অপূর্ব্ব সম্পদ।

'পূরবী' ও 'মহুয়া' কাব্য দুইখানি রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের রচনা। কিন্তু এই দুইখানি কাব্যের সকল কবিতাতেই তারুণ্যের রঙ্‌ ধরিয়াছে—প্রত্যেক কবিতার মধ্য দিয়া চিরতরুণ কবিমানসটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তরুণ বয়সে রচিত 'সোনার তরী' প্রভৃতি কাব্যে কবির যে উদ্দাম কল্পনা ও বর্ণনাভঙ্গী দেখিয়াছি, পরিণত বয়সের রচনা এই 'পূরবী' ও 'মহুয়া' কাব্যে আবার তাহারই ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাই।

'বনবাণী'তে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত নিবিড়তম পরিচয়ের মাধুর্য্য আছে। 'পুনশ্চ', 'পরিশেষ' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের আধুনিক রচনা। 'পুনশ্চ' গ্রন্থখানি গদ্যকাব্য—অর্থাৎ, গদ্যে লেখা কাব্য। গদ্যে লেখা হইলেও ইহার মধ্যে একটি ছন্দ আছে, তাল আছে—হিল্লোলিত কবিতার রস ত' আছেই। এই ধরণের রচনা-পদ্ধতি কবির এক নূতন সৃষ্টি। গদ্যের মধ্য দিয়াও কাব্যের ছন্দ যে তরঙ্গায়িত করিয়া তোলা যায়, তাহা এই ধরণের কাব্য রচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ চমৎকার ভাবে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

জগতে যাহা কিছু ছোট, যাহা কিছু তুচ্ছ ও সামান্য, তাহাকেও কবি অসামান্য বলিয়া জানিয়াছেন। কবির 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতার কৃষ্ণকান্ত, 'রাজা ও রাণী' নাটকের ভৃত্য শঙ্কর, 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন' গল্পের ভৃত্য রাইচরণ, 'দুই বিঘা জমি'র মালিক দরিদ্র উপেন—সকলেই কবির মনকে স্পর্শ করিয়াছে, কেহই তাঁহার কাছে নগণ্য বা পর নহে। সমাজে যাহারা সামান্য ও সাধারণ তাহাদের সকলের প্রতি কবির সহানুভূতি আছে। তাহাদের মধ্যেও কবি অসাধারণতা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহাদের চরিত্রের মধ্যে যে মহত্ত্ব, মাধুর্য্য ও অসাধারণতা কবি লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা তিনি তাঁহার কাব্যে, গল্পে ও নাটকে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কবি। রবীন্দ্র-কাব্যে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ যেন নব কলেবর লাভ করিয়াছে। প্রকৃতিকে কবি

তাঁহার কাব্যে আপন মনের মাধুরী দিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া নূতন রূপ দান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বিশ্বপ্রকৃতি জড় অথবা প্রাণহীন নহে। রবীন্দ্র-কাব্যে বিশ্বপ্রকৃতি প্রাণময়ী। জড় বিশ্বপ্রকৃতিতে কবি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বর্ষা, বসন্ত, শরৎ, হেমন্ত, শীত, গ্রীষ্ম,—সকল ঋতুর বর্ণনায় কবি অনুপম সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যে বর্ষা সম্বন্ধীয় কবিতাই রূপে রসে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কালিদাসের মত রবীন্দ্রনাথ বর্ষার কবি। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় কবিতার ভিতর দিয়া দেখাইয়াছেন যে প্রকৃতি ও মানুষের জীবন একসূত্রে বাঁধা আছে। প্রকৃতির সহিত মানুষের একটা অচ্ছেদ্য আত্মীয়তা উপলব্ধি করিয়া কবি গাহিয়াছেন—

"স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।"

জল-স্থল-আকাশের সহিত একটা নিবিড় একাত্মতা ও নিজেকে বিশ্বপ্রকৃতির নব নব বৈচিত্র্যের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া বিলাইয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতাতেই আছে। কবি অনুভব করিয়াছেন যে প্রকৃতির সহিত মিলনে আনন্দ—বিচ্ছেদে দুঃখ ও বিষাদ। কবির বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় কবিতায় এইটি সব চেয়ে বড় কথা।

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রেমিক। বাল্যকাল হইতেই কবির দেশানুরাগ যে কত প্রবল তাহার পরিচয় তাঁহার আত্মজীবনী 'জীবনস্মৃতি'তে এবং তাঁহার বহু কবিতায় পাওয়া যায়। শত

অত্যাচারক্লিষ্ট বাঙ্গালীর হীন অবস্থা, দাস্য ও নিশ্চেষ্টতা কবির চিত্তকে পীড়িত করিয়াছে। স্বদেশের যে সব লোক নীরবে শত শতাব্দীর অত্যাচারের ভারে পিষ্ট হইতেছে, অথচ কোনও প্রতিকার করিতে পারিতেছে না, তাহাদের উদ্দেশ্যে কবি বলিয়াছেন—

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়ে বলিতে হবে—
মুহূর্ত্তে তুলিয়ে শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে !
যার ভয়ে ভীত তুমি, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে,—"

বঙ্গমাতা স্নেহাধিক্যে ক্রমাগত বিধি-নিষেধের গণ্ডী দিয়া সন্তানদের পঙ্গু ও নিশ্চেষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহাতে কবি ব্যথিত হইয়া বলিয়াছেন—

"সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননি,
রেখেছো বাঙ্গালী করে মানুষ করনি।"

ইহার ব্যঞ্জনা এই—বাঙ্গালী প্রকৃত মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত। নূতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ না করিলে আমাদের মুক্তি হইবে না। সেই জন্য নববর্ষে কবি সমস্ত ভারতবাসীর হইয়া বলিতেছেন—

"নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে, তোমার চরণে, হে ভারত, লবো শিক্ষা।

পরের ভূষণ, পরের বসন, তেয়াগিবো আজ পরের অশন,
যদি হই দীন, না হইব হীন, ছাড়িব পরের ভিক্ষা।”

এই দীক্ষাই মনুষ্যত্বের দীক্ষা।

দেশপ্রেমিক কবি স্বদেশ জননীর নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছেন—

“নিজ হস্তে শাক-অন্ন তুলে দাও পাতে, তাই যেন রুচে,—
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে, তাহে লজ্জা ঘুচে॥”

পরের উপর নির্ভর না করিয়া আপনার শাক-অন্নেও তুষ্টির নামই মনের স্বাধীনতা। মনের স্বাধীনতা আসিলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আসিতে দেরী হয় না। বঙ্গভূমিকে ভালবাসিয়া কবি বারবার বলিয়াছেন—

“আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি,—
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।”

এবং—

“তোমার ধূলামাটি অঙ্গে মাখি’ ধন্য জীবন মানি।”

বঙ্গদেশে জন্মিয়া কবি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেন—

“সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে ;
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালবেসে !”

স্বদেশভক্ত কবি ভারতের তথাকথিত উচ্চ-নীচের মধ্যে কৃত্রিম ভেদাভেদ ও বিরোধ দূর করিবার কথা বলিয়াছেন

এই সকল ভেদাভেদ ভুলিলে তবেই আমাদের পরাধীনতার গ্লানি ঘুচিবে। এই ভেদবুদ্ধি কবির চিত্তকে এতই অধীর করিয়া তুলিয়াছিল যে জাত্যভিমানীদের উদ্দেশে কবির সতর্কবাণী অভিশাপের মত নির্ঘোষিত হইয়াছে—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছো অপমান,
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।"

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা, অতীত গৌরবের আতিশয্য এবং বিদেশ ও বিদেশীর প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ নাই। কবির 'ভারত-তীর্থ' শীর্ষক কবিতাটি বিশ্বজনীন উদার মনোভাবের নিদর্শন। পুণ্যতীর্থ ভারতবর্ষকে কবি সকল জাতির মিলনক্ষেত্র বলিয়াছেন—

"এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য, হিন্দু মুসলমান,
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন, ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক্ অপনীত সব অপমান ভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ-নীরে।
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥"

রবীন্দ্রনাথ চির-তরুণ। এই চির-তরুণ কবি তারুণ্যের জয়গান করিয়াছেন 'বলাকা'র প্রথম কবিতায়—

"ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয়রে আমার কাঁচা।"

সর্ব্বোপরি রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যের কবি। তিনি তাঁহার বিভিন্ন কবিতায় সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীকে নানারূপে নানা ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। কবি জীবনকে নব নব রূপ ও রূপক দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; মরণকেও তিনি অভিনব রূপ, মাহাত্ম্য ও মাধুর্য্য দান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের দেশের কোনও কাব মরণকে এমন বরণীয় বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই—

"মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান!"

অভিনব ভাব-কল্পনার সহিত অপরূপ ছন্দের সম্মিলনে রবীন্দ্র-কাব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের এক নূতন সম্পদ। সংস্কৃত সাহিত্যের রসমাধুর্য্য এবং ইয়োরোপীয় সাহিত্যের ভাবৈশ্বর্য্য রবীন্দ্র-সাহিত্যে মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব কল্পলোকের সৃষ্টি করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে বড় দুঃখে বলিয়াছিলেন—

"বিশ্বের মাঝে ঠাঁই নাই কাঁদিছে বঙ্গভূমি,
গান গেয়ে কবি জগতের কোলে ঠাঁই করে দাও তুমি!"

কবির সেই কামনা সফল হইয়াছে।

কেবল কাব্য-সাহিত্য কেন, বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্য,

উপন্যাস-সাহিত্য, ছোট গল্প, প্রবন্ধ-সাহিত্য প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের দানে সুসমৃদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্য রচনায় বিশেষত্ব আছে। তিনি নাটক রচনায় প্রচলিত আদর্শের অনুসরণ করেন নাই। 'বিসর্জ্জন', 'ফাল্গুনী', 'অচলায়তন', 'ডাকঘর', 'রাজা', 'মুক্তধারা', 'তপতী', 'মায়ার খেলা', 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'মালিনী', 'শারদোৎসব', 'চণ্ডালিকা', 'নটীর পূজা' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ নাটক। এই সকল নাটক ঘটনা-প্রধান নহে। এই-গুলিতে কোন একটি বিশ্বজনীন সত্যকে নাটকীয় রূপ দান করা হইয়াছে।

গীতিবহুলতা রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে পরম উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে।

উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথ নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসের ভিতর দিয়া তিনি সমাজের বহু সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন এবং সেগুলি পাত্রপাত্রীর কথোপকথনের মধ্য দিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'নৌকাডুবি', 'চোখের বালি', 'শেষের কবিতা', 'যোগাযোগ', 'দুই বোন', 'চার অধ্যায়', প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস। এই সকল উপন্যাসের ভাষা যেমন স্বচ্ছন্দ, বর্ণনাকৌশল তেমনি চমৎকার। চরিত্র-চিত্রণেও রবীন্দ্রনাথ অসীম ক্ষমতা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দান করিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রগুলি যেন অভিনব রূপে মণ্ডিত ভাব ও অনুভূতি।

চরিত্র সৃষ্টি করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ নরনারীর অন্তর্জগতের রহস্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার উপন্যাস বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছে। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া চরিত্র অঙ্কন রবীন্দ্র-পূর্ব্ব বাঙ্গালা সাহিত্যে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে ছিল রোমান্স ; আসল উপন্যাসের সূত্রপাত 'নষ্টনীড়' ও 'চোখের বালি' হইতে।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলি অতুলনীয়। যে ছোট গল্পে আজ বাংলা-সাহিত্য জগতের অন্যান্য সাহিত্যের প্রায় সমকক্ষ—সেই গল্পের সূত্রপাত তাঁহার 'গল্পগুচ্ছ' হইতে। বিশ্বসাহিত্যে এমন সুন্দর ছোট গল্প অল্পই আছে। ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ জগতের যে কোনও শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকের সমকক্ষ। রবীন্দ্রনাথ কবি। সেইজন্য তাঁহার ছোট গল্পগুলিতে প্রচুর কাব্যসম্পদ বিদ্যমান। তাঁহার ছোট গল্পে আমরা পাই সুদূরবিহারী কল্পনার প্রসার এবং ভাবে ভরা মধুর সঙ্গীতময় ভাষার হিল্লোল। কবির অন্তর্দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তাই তাঁহার ছোট গল্পে মানব-হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি এবং তাহাদের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তাঁহার ছোট গল্পে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ প্রাধান্য লাভ করিয়া গল্পগুলির মনোজ্ঞতা বাড়াইয়া দিয়াছে। ছোট গল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিশেষত্ব এই যে তিনি আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাগুলিকেই একটা অপূর্ব্ব রহস্যময় রূপ দান করিয়াছেন। তাঁহারই ভাষায়,—"যাহা ছিল চির পুরাতন। তারে পাই যেন

হারাধন।" ছোট গল্পে স্বল্প পরিসরের মধ্যে চরিত্র-বিশ্লেষণ-পটুতাও রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ। 'কাবুলিওয়ালা', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন', 'মাষ্টার মহাশয়', 'শুভা', 'পোষ্টমাষ্টার', 'ছুটি', 'অতিথি' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গল্প। গল্পগুচ্ছের প্রত্যেক গল্পই হীরকখণ্ডের মত ভাস্বর।

সমালোচনায় ও প্রবন্ধ-সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথের স্থান অতি উচ্চে। শিক্ষা, সমাজ ও সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার গভীর জ্ঞান, সহৃদয়তা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত প্রবন্ধাবলী ভাষার ঐশ্বর্য্যে, রচনাভঙ্গীর অভিনবত্বে ও ভাব-গভীরতায় বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সকল রচনাতেই কবি, প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি কবি। তাই তাঁহার প্রবন্ধ বাঙ্গালা দেশে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যশাখার প্রবর্ত্তন করিয়াছে; কবিতার লেখনীতে লেখা প্রবন্ধ সরস হইয়া উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। যুক্তির সহিত কল্পনার সুন্দর সরস সমাবেশ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলির বিশেষত্ব। সেখানে তত্ত্ব কিছু কম নাই, তথ্যও বহুল পরিমাণে পাওয়া যাইবে, কিন্তু তাহার চেয়েও বড় জিনিষ কবির সূক্ষ্ম আদর্শবাদ, কল্পনার প্রসার এবং প্রকাশভঙ্গীর মাধুর্য্য। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি পড়িবার পর মনে হয় যে তিনি সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। সোজা পথে নয়, সৌন্দর্য্যের বক্রপথে। যুক্তি অপেক্ষা বক্রোক্তি ও ব্যঞ্জনার প্রাধান্য

ঘটিয়াছে প্রবন্ধগুলিতে। 'সাহিত্য', 'লোক সাহিত্য', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'সমাজ', 'স্বদেশ', 'শিক্ষা', 'ধর্ম্ম', 'পঞ্চভূত' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধ-গ্রন্থ।

রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ-গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। বিজ্ঞান এবং ভাষাতত্ত্বের জটিল বিষয়গুলি কবির লেখনীর যাদুস্পর্শে সরস-সুন্দর হইয়াছে। 'বিশ্বপরিচয়' ও 'শব্দতত্ত্ব' নামক গ্রন্থ দুইখানি যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক।

'ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী', 'রাশিয়ার চিঠি', 'জাপান যাত্রীর ডায়েরী', 'যাত্রী', 'ছিন্নপত্র' প্রভৃতিতে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের কথা লিপিবদ্ধ আছে। কবির সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে এই সকল গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য।

ইংরাজী ভাষার উপর রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ দখল ছিল। তিনি নিজেই তাঁহার বহু কবিতার ও গদ্যগ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। সেগুলি ইউরোপে ও আমেরিকায় বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। ইংরাজীতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য, নাটক, গল্প ও উপন্যাস পাঠ করিয়া পাশ্চাত্ত্য দেশবাসী মুগ্ধ হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশের অন্যান্য নানা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের রচনা অনূদিত হইয়া বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। বাঙ্গালায় মূল রবীন্দ্র-কাব্যের রসাস্বাদ করিবার আগ্রহও পাশ্চাত্ত্য দেশের অধিবাসীদিগের কম নহে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিবার মানসে ইউরোপের

কেহ কেহ আজকাল বাঙ্গালা শিখিয়া থাকেন, ইয়োরোপের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্য এবং বাঙ্গালা ভাষা অধ্যাপনার ব্যবস্থাও আছে। ইহা বাঙ্গালার বিশেষ সম্মানের কথা, সন্দেহ নাই।

আজ রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত। রবীন্দ্রনাথের এই খ্যাতির কারণ প্রধানতঃ দুইটি। প্রথমতঃ, তাঁহার সাহিত্যের রস-বস্তুর বিশ্বজনীনতা। উহার মধ্যে এমন একটা সার্ব্বজনীন আবেদন আছে, যাহার ফলে বিশ্ববাসী ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির আধ্যাত্মিকতা এই বিশ্বজনীনতাকে পরম শ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির আর একটি কারণ তাঁহার বিশ্বভ্রমণ। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে কবির চিত্ত যেমন প্রসার লাভ করিয়াছিল, দৃষ্টিশক্তি প্রখর ও সৃষ্টিশক্তি অফুরন্ত হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার যশ দেশে বিদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব অনুরাগ ছিল, অপার আনন্দ এবং দুর্দ্দমনীয় উৎসাহ ছিল। তাই দেখি যে বালক বয়স হইতে পরিণত বয়স পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতের নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন,—সেই সব দেশে তাঁহার বাণী, ভারতের বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। কবির বাণী শুনিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে, কৌতূহলী হইয়া কবির কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি অনুশীলন করিয়া নিজদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছে।

কবি তাঁহার প্রথম যৌবনে তাঁহার প্রতিভা উন্মেষের সমকালেই তাঁহার জীবনের ব্রত নির্দ্দেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন—

"আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া আকুল পাগল পারা।"

কবির এ কামনা সার্থক হইয়াছে। কত মহাদেশ, সমুদ্রপারের কত দ্বীপ, অসংখ্য নগর ও লোকালয়—এ সব বারংবার অতিক্রম করিয়া রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছেন। সমগ্র জীবনে কবির সৃষ্টির যেমন বিরাম ছিল না, তেমনি বারবার বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিয়া তিনি এই ভারতভূমির নিজস্ব আধ্যাত্মিক সাধনার বাণী প্রচার করিয়াছেন, সমগ্র জগতের মানবসমাজের কাছে এদেশের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

বালক বয়সেই রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণস্পৃহা জাগরিত হইয়াছিল। যখন তাঁহার একাদশ বৎসর বয়স সেই সময়ে তিনি তাঁহার পিতার সহিত হিমালয়-ভ্রমণে যান। পনের বৎসর বয়সের সময়ে তিনি পুনরায় তাঁহার পিতার সহিত হিমালয় দর্শনে গমন করেন। সতের বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার মধ্যম অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে বোম্বাই প্রদেশের আহম্মদাবাদ নগরে অবস্থান করেন। ইহার অল্পকাল পরেই তিনি শিক্ষার্থিরূপে ইংলণ্ডে গমন করেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতের বহু দেশে ভ্রমণ করেন। ভ্রমণে তিনি কখনও ক্লান্তি বোধ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের দেশভ্রমণ তাঁহার শিক্ষা, আনন্দ ও কবিতার উৎস ছিল। বিশ্বভ্রমণে তিনি যে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন

তাহা কৃপণের ধনের মত তিনি নিজের অন্তরমধ্যে লুকাইয়া রাখেন নাই, সমগ্র বিশ্বে তাহা বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনকালে বৌদ্ধাচার্য্যেরা যেমন ভারতের সংস্কৃতি ও সাধনার বর্ত্তিকা সমগ্র এশিয়া মহাদেশে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন—রবীন্দ্রনাথ তেমনই কেবল এশিয়াতে নহে, ইয়োরোপে ও আমেরিকায়, সমগ্র বিশ্বে,—ভারতের সাধনা, মুক্তি ও শান্তির বাণী প্রচার করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-পরিভ্রমণ বিভিন্ন দেশে অসাধারণ উদ্দীপনা আনিয়াছিল। পৃথিবী জুড়িয়া রবীন্দ্রনাথকে লইয়া উৎসব উদ্দীপনার বিরাম ছিল না। তিনি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইটালী, রাশিয়া, আমেরিকা, পারস্য, যবদ্বীপ, বলি-দ্বীপ, চীন, জাপান—কত দেশে গিয়াছেন! যেখানেই গিয়াছেন সেখানেই তিনি রাজকীয় সমারোহময় সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছেন। তিনি যখনই যে দেশে গিয়াছেন তখনই সেই দেশের জ্ঞানী ও গুণিজনের সহিত তাঁহার ভাবের বিনিময় হইয়াছে এবং তাহার ফলে শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে বিশ্বের জ্ঞানী ও গুণিজনেরা বিহ্বল হইয়া গিয়াছেন। ১৯১৩ সালে একবার তিনি একাদিক্রমে তের মাস ইয়োরোপে ও আমেরিকায় ভ্রমণ করেন। তাঁহার এই ভ্রমণ অভিযান বিশ্বজয়ের অভিযানের তুল্য। এ অভিযান দেশ জয়ের জন্য নয়, তাহার চেয়ে ঢের বড়, সমগ্র জগতের হৃদয়রাজ্য জয়ের জন্য।

বিশ্বভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বদাই আত্মপ্রচার এড়াইয়া

চলিতেন। তথাপি যখন তিনি যে দেশে যাইতেন সেখানে সাংবাদিকগণ সকল সময়ে তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিত। রবীন্দ্রনাথ সকল দেশেই সম্রাটের চেয়ে অনেক অধিক সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছিলেন এবং ঋষির মত চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়া বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি যেবার প্রথম জাপানে গমন করেন সেবার জাপানের প্রধান মন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রিগণ, সেখানকার সুবিখ্যাত কবি নোগুচি প্রভৃতি তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত করেন। কোবে, ইয়াকোহামা প্রভৃতি জাপানের যে নগরে তিনি যখন গিয়াছেন সেই নগরই তখন কবির সম্বর্দ্ধনায় ঐশ্বর্য্যের মায়াপুরী রূপে সাজিয়া উঠিয়াছে। তিনি যখনই যেখানে যাইতেন, তখনই সেখানে,—এমন কি রেলপথপার্শ্বে—বৌদ্ধগণ ভক্তিবিনম্রচিত্তে কবিকে দর্শন করামাত্রই মস্তক আনত করিয়া শ্রদ্ধা জানাইতেন। আমেরিকায় "পূর্ব্ব-ভারতের কবিকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর বোহিমিয়ান ক্লাবের ভোজনশালা এক আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যময় ইন্দ্রপুরীতে পরিণত হইয়াছিল।" এই বিবরণ আমেরিকার 'স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কো বুলেটিন' নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কবি একবার মুসোলিনীর দেশ ইটালীতেও গমন করেন। নেপ্‌লসে মুসোলিনীর প্রতিনিধিরা কবির সম্বর্দ্ধনা করেন। নেপ্‌লস্ হইতে কবিকে স্পেশাল ট্রেণে করিয়া রোমে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে মুসোলিনী কবিকে সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন এবং বলিলেন, ইটালীয় ভাষায় কবির

যে কয়টি কাব্য অনূদিত হইয়াছে তাহার কোনটিই তাঁহার অপঠিত নাই ; ইটালীতে কবির অগণিত পাঠকদের মধ্যে তিনিও একজন।

কবিকে দেখিবার জন্য, তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য ইয়োরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, বক্তৃতাদানের আসরে, পথে-ঘাটে, রেল ষ্টেশনে—সর্ব্বত্র বিপুল জনসমাগম হইত। রাজসন্দর্শনের জন্যও বোধ হয় কোন দেশে এমন জনসমাগম হয় না।

পৃথিবীর বহু দেশে রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু ভারত ও ভারতীয়দিগের প্রতি যে দেশ শ্রদ্ধান্বিত নহে, সে দেশের আমন্ত্রণ কবি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সে দেশে কবি কখনও পদার্পণ করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ যখন জাপানে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে ক্যানাডার অন্তর্গত ভ্যান্‌কুভার হইতে তথায় গমনের জন্য কবির নিমন্ত্রণ আসে। কিন্তু ক্যানাডায় ভারতীয়দের প্রতি অবজ্ঞামূলক নীতি প্রচলিত থাকায় কবি তথায় যাইতে অস্বীকার করিয়া ঐ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। যে দেশে তাঁহার স্বদেশবাসী অবজ্ঞাত হয় কবি সেই দেশে যাইতে সম্মত হন নাই। রবীন্দ্রনাথের আত্মসম্মানজ্ঞান, দেশাত্মবোধ ও দেশপ্রেম এমনিই নিবিড় ছিল। স্বদেশবাসীর অপমানকে তিনি নিজের অপমান মনে করিতেন।

অষ্ট্রেলিয়াতেও ভারতীয়গণ অবজ্ঞাত ও নির্য্যাতিত হইত। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণেও যান নাই।

বিশ্বভ্রমণের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর, তথা ভারতের মর্য্যাদা বিশ্বজগতে বাড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার দ্যুতিতে ভারত ও বাঙ্গালার গৌরব বাড়িয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যও রবীন্দ্র-প্রতিভার আলোকে অপরূপ মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টিতে বঙ্গভাষা উর্ব্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। একদিন যে ভাষায় ক্ষীণধ্বনি একতারা যন্ত্রের মত কেবল গ্রাম্য রাগিণী বাজিত, রবীন্দ্রনাথ তাহাতে একটির পর একটি তার চড়াইয়া তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়াছেন। আমাদের কবির চিত্ত ছিল সপ্ততন্ত্রী বীণার মত—তাহাতে কত বিভিন্ন সুর, কত মূর্চ্ছনাই না ধ্বনিত হইয়াছে! রবীন্দ্রনাথের দৈবী-প্রতিভা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে একার্দ্ধ শতাব্দী-কালের মধ্যে এক সহস্র বর্ষের সমৃদ্ধি দান করিয়াছে!

ইকবাল

"ইকবাল ভারতের কবি ; সুতরাং আমরা তাঁহাকে ইন্দো-মুসলিম সংস্কৃতির কবি রূপে বিচার করিব। ইকবালের কাব্যে মরমীবাদ, দর্শন ও স্বাজাতিকতার বাণী অপূর্ব্ব রূপ নিয়াছে।" —ইকবালের মৃত্যুর পর স্যার আকবর হায়দরী এই কথাগুলি বলিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন। ইকবালের বিচিত্র ভাবধারা-সমৃদ্ধ কবিপ্রতিভার পরিচয় এই মন্তব্যে অল্প কথায় চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইন্দো-মুসলিম সংস্কৃতির কবি হইবার মত তুর্লভ যোগ্যতা ইকবাল শুধু প্রতিভা দিয়াই নহে, জন্ম দিয়াও অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ ছিলেন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। বিভিন্ন রচনায় ইকবাল এই কথা সগর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছেন। ইকবালের জন্মের প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার এক পূর্ব্বপুরুষ ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। জনশ্রুতি এই যে তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন একজন মুসলমান দরবেশ। সুফী মতবাদের প্রতি তাঁহাদের বংশের অনুরাগ সুবিদিত। ইকবালের পিতাও একজন সুফী ছিলেন। ইকবালের কবিতাতেও সুফী মতবাদের সুর ধ্বনিত হয়।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী পাঞ্জাবের অন্তর্গত শিয়ালকোট সহরে ইকবাল জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবন

তাঁহার যথারীতি মক্তবেই আরম্ভ হয়। পরে ইংরেজী স্কুলে পড়িয়া শিয়ালকোট হইতেই ইকবাল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শিয়ালকোটের স্কচ্ মিশন কলেজ হইতে এফ্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য লাহোরে আসেন। লাহোর সরকারী কলেজ হইতে তিনি সসম্মানে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং একটি স্বর্ণপদক লাভ করেন।

শিয়ালকোটে অবস্থিতিকালে মৌলবী সৈয়দ মীর হাসান নামে একজন বিখ্যাত প্রাচ্য-বিদ্যা বিশারদের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য ইকবালের হইয়াছিল। শুধু আরবী ভাষা ও সাহিত্যেই নহে, সমগ্র ইসলামীয় সাহিত্যে ও সংস্কৃতি ।বষয়ে মৌলবী মীর হাসানের গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। ইস্‌লামীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি যে গভীর অনুরাগ ইকবালের উত্তর জীবনে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল তাহার উৎসমূল যে মৌলভী মীর হাসানের সাহচর্য্য শুধু তাহাই নহে; ইকবালের জীবনে কবিত্বের স্ফুরণও হইয়াছিল শিয়ালকোটে এই প্রবীণ পণ্ডিত মীর হাসানের স্নেহচ্ছায়ায়। মীর হাসান একদা তাঁহার ছাত্রের রচিত কবিতা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া ইকবালকে পাঞ্জাবীতে না লিখিয়া উর্দ্দু ভাষায় কাবতা রচনা করিতে পরামর্শ দেন। হাসান সাহেবের এই স্নেহঋণের কথা ইকবাল কৃতজ্ঞ চিত্তে বার বার স্মরণ করিয়াছেন।

ইকবাল যখন লাহোরে আসেন সেই সময় লাহোর ছিল একটি প্রধান সংস্কৃতিকেন্দ্র। সেটা উনবিংশ শতকের শেষপাদ।

উর্দ্দু ভাষা ও সাহিত্য তখন ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যকে ক্রমশঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিতেছে ; উর্দ্দু ভাষার বিস্তার ও উন্নয়ন-কল্পে নানা সমিতি স্থাপিত হইতেছে। লাহোরেও ঐরূপ কয়েকটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। এইসব সমিতির কয়েকটিতে উর্দ্দু কবিতার মজলিসও বসিত। হাকিম আমীনউদ্দীনের গৃহে এইরূপ একটি কবিতার মজলিস ছিল। একদা এই মজলিসে ইকবাল একটি স্বরচিত উর্দ্দু কবিতা আবৃত্তি করেন। এই মজলিসে লাহোরের বিখ্যাত উর্দ্দু কবি অর্শদ উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই তরুণ কবির রচনা শুনিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন ইকবালের উত্তর জীবনে তাহা সার্থক হইয়াছিল।

ইকবাল এইভাবে বিভিন্ন মজলিসে মাঝে মাঝে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করিতেন, কিন্তু তাঁহার কবিখ্যাতি তখনও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রমহলের বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে নাই। এই সময় একটি সাহিত্য মজলিসে ইকবাল তাঁহার বিখ্যাত কবিতা 'হিমালা' (হিমালয়) আবৃত্তি করেন। এই কবিতাটি প্রাচীন ফার্সী ছন্দে রচিত এবং ইহাতে ইয়োরোপীয় ভাবধারার সহিত প্রবল দেশাত্মবোধের অপূর্ব্ব সম্মিলন ঘটিয়াছে। এই কবিতাটি যখন ইকবাল আবৃত্তি করিলেন তখনই তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। নানাস্থান হইতে কবিতাটি ছাপাইবার তাগিদ আসিল। কিন্তু ইকবাল বলিলেন, সংশোধন না করিয়া উহা ছাপা চলিবে না।

এই সময়ে স্যার আবদুল কাদের 'মাখজান' নামে একখানি উর্দ্দু পত্রিকা প্রকাশ করেন। কাদের সাহেব ব্যারিষ্টার ছিলেন; কিন্তু কাব্যানুরক্তি ও সহৃদয়তা তাঁহার প্রধান গুণ ছিল। লাহোরে অধ্যয়ন করিবার কালে যে কয়েকজনের প্রভাব ইকবালের জীবনে সঞ্চারিত হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে কাদের সাহেব অন্যতম। কাজেই তিনি যখন 'হিমালা' কবিতাটি তাঁহার 'মাখজান' পত্রিকার জন্য চাহিলেন তখন ইকবাল অসম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারিলেন না। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের 'মাখজান'-এর প্রথম সংখ্যায় 'হিমালা' প্রকাশিত হইল। এই পত্রিকার মারফতে ইকবাল ভারতবর্ষের উর্দ্দুভাষী পাঠক সমাজে পরিচিত হইলেন। ইহার পর তাঁহার জনপ্রিয়তা দ্রুতভাবে বাড়িয়া চলিল। বিলাত যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইকবাল নিয়মিত ভাবে 'মাখজান'-এ লিখিতেন এবং ভারতবর্ষের প্রধান উর্দ্দু পত্রিকার প্রায় সবগুলিতেই তাঁহার লেখা বাহির হইত।

শুধু পত্রিকাতেই ইকবালের কবিতা সীমাবদ্ধ ছিল না। বিবিধ সাহিত্যিক আসরে ও মজলিসে, আঞ্জুমান প্রভৃতির বার্ষিক অধিবেশনে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তির জন্য ইকবাল নিমন্ত্রিত হইতেন। তিনি সানন্দে ইহাতে যোগদান করিতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর মধুর ছিল, আবৃত্তির ভঙ্গীও ছিল চমৎকার। তাঁহার আবৃত্তি শুনিবার জন্য হাজার হাজার লোক সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিত। আঞ্জুমানের বার্ষিক অধিবেশনে ইকবাল যে সব কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে 'শেকোয়া'

(অভিযোগ) এবং 'জওয়াব-ই শেকোয়া' (অভিযোগের উত্তর) বিশেষ প্রসিদ্ধ। উনবিংশ শতকের বিখ্যাত উর্দ্দু কবি হালীর 'মুসদ্দস'-এর পর 'শেকোয়া'র মত অগ্নিগর্ভ কবিতা উর্দ্দু সাহিত্যে আর রচিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। বিলাত হইতে ফিরিয়া ইকবাল এই কবিতা দুইটি রচনা করেন।

লাহোরের সরকারী কলেজ হইতে ইকবাল এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করেন এবং লাহোর ওরিয়েণ্টাল কলেজে ইতিহাস ও দর্শনের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। শিক্ষক হিসাবেও তাঁহার যথেষ্ট সুনাম হইয়াছিল।

এই সময়ে ইকবাল নানাবিষয়ে কতকগুলি মৌলিক কবিতা রচনা করেন। ইহা ছাড়া ইংরাজী সাহিত্য হইতে কতকগুলি নীতিগর্ভ ও শিশুপাঠ্য কবিতা তিনি সযত্নে উর্দ্দুতে অনুবাদ করেন। তাঁহার প্রথম জীবনের কবিতাগুলির মধ্যে 'হিমালা' ছাড়া আরও কতকগুলি কবিতা যথেষ্ট খ্যাতি পাইয়াছে। 'গুল-ই-রঙ্গীন' (রঙ্গীন ফুল), 'পরিন্দে-ই-ফরিয়াদ' (বিহঙ্গের অভিযোগ), 'শামা ও পরওয়ানা' (প্রদীপ ও পতঙ্গ), 'তারানা-ই-হিন্দ' (ভারত সঙ্গীত), 'কেনার-ই-রাবী' (রাবী নদীর তীরে) প্রমুখ কবিতাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত।

জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই নবীন ও প্রাচীনের সংঘর্ষ অনিবার্য্য ভাবে দেখা দেয়। অতীতে বার বার এই সংঘর্ষ দেখা দিয়াছে

ভবিষ্যতেও যে বহুবার ইহা দেখা দিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। চিন্তার আদর্শে, বিশেষতঃ সাহিত্য ক্ষেত্রে, এই বিরোধ একটি নিত্য সিদ্ধ ঘটনা, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালেই ইহা ঘটিয়া থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে উর্দ্দু কবিতা লইয়াও এই বিরোধ আরম্ভ হয়। উভয় পক্ষেই প্রখ্যাত কবিগণ ও তাঁহাদের সমর্থকগণ বাদানুবাদমূলক ও ব্যঙ্গাত্মক কবিতায় ও প্রবন্ধে প্রতিপক্ষকে ভ্রান্ত ও বিপথগামী বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিতেন না। ইকবালকেও এমন এক শ্রেণীর প্রবল প্রতিপক্ষের তীক্ষ্ণ সমালোচনা-শরের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ছন্দ, ভাব প্রভৃতি লইয়া ইকবালের বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার ছিল না। কাজেই বিরুদ্ধ সমালোচকগণ বলিতে লাগিলেন যে, ইকবাল পাঞ্জাবী, তাই উর্দ্দুর আভিজাত্য ও শুচিতা নষ্ট করিয়া দিতেছেন। ইকবাল এই বাদপ্রতিবাদে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধবাদিগণকে নিরস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

লাহোরে বাসকালে ইকবাল তাঁহার কলেজের অধ্যাপক ডাঃ টমাস আর্ণল্ডের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। টমাসের প্রভাব ইকবালের সমগ্র জীবনকে পরিচালিত করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শিয়ালকোটে মৌলভী মীর হাসানের সাহচর্য্য একদিকে যেমন ইকবালকে মুসলিম ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল করিয়া তুলিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি টমাস আর্ণল্ডের সঙ্গ তাঁহাকে পাশ্চাত্য

চিন্তাধারা, আধুনিক জগতের বিজ্ঞানসম্মত বুদ্ধি ও যুক্তি প্রভৃতির প্রতি অনুরক্ত করিয়া তুলিয়াছে। গভীর অনুভূতি, উদার প্রাণবত্তা, সুষ্ঠু ।বশ্লেষণ, তীক্ষ্ণ যুক্তি প্রভৃতির সমন্বয়ে যে দৃঢ় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ইকবালের উত্তর জীবনে ঘটিয়াছে, তাহার মূলে মীর হাসানের সঙ্গে রহিয়াছেন স্যার টমাস আর্ণল্ড। যৌবনের প্রথমাংশ পর্য্যন্তই জীবনের গঠনের কাল; বাকী জীবন এই জীবনাংশের বৃহত্তর ও গভীরতর প্রকাশ মাত্র। ইকবালের জীবন প্রভাত শিয়ালকোটে ও লাহোরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির দুই দিকপালের প্রভাবে পুষ্ট হইয়া বাকী জীবনের নিঃসংশয় সূচনা করিয়াছে।

এতদিন ইকবাল কবিতা লিখিলেও কোন পুস্তক প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার প্রথম পুস্তক এই সময়ে বাহির হইল অর্থনীতি সম্বন্ধে। ইহা শুধু তাঁহার প্রথম পুস্তক নহে, ইহাই উর্দ্দু ভাষাতে অর্থনীতি সম্বন্ধীয় প্রথম পুস্তক।

স্যার টমাস আর্ণল্ডের উপদেশে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ইকবাল ইয়োরোপে যাত্রা করেন। বোম্বাই যাইবার পথে তিনি দিল্লীতে বিখ্যাত কবি আমীর খস্রু ও ঘালিবের সমাধিস্থল দর্শন করিয়াছিলেন। এইখানে এমন একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে ইকবালের কাব্যপ্রীতির চরম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইকবাল যখন ঘালিবের সমাধিস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন তখন একটি লোক ঘালিবের একটি কবিতা আবৃত্তি করে। ইহা শুনিয়া ইকবাল এতটা অভিভূত হইয়া

পড়েন যে তিনি স্থানকাল ভুলিয়া ঘালিবের সমাধি আলিঙ্গন করিয়া শিশুর মত ক্রন্দন করিতে থাকেন।

ইয়োরোপে ইকবাল মোট তিন বৎসরকাল ছিলেন। এই সুযোগে তিনি ইয়োরোপের চিন্তাধারার সহিত নিবিড় ভাবে পরিচিত হইলেন। ইয়োরোপের—বিশেষ করিয়া কেম্ব্রিজ, লণ্ডন এবং বার্লিনের—গ্রন্থাগারগুলি হইতে ইকবাল যে জ্ঞান আহরণ করেন তাহা তাঁহার ভাবী জীবনগঠনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তি যেমন পর্য্যাপ্ত অন্নব্যঞ্জন পাইলে গোগ্রাসে গিলিতে থাকে, তেমনি করিয়া ইকবাল এই গ্রন্থাগারগুলি হইতে জ্ঞান আহরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিন্তাধারা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ইকবালের এই সময়কার রচনার মধ্যে ছুইটি বিশিষ্ট ভাবধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। একটির মধ্যে প্রকাশ পাইল তৎকালীন ইয়োরোপের সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থান্ধ জাতীয়তাবাদের প্রতি তাঁহার নিদারুণ বিতৃষ্ণা। তাঁহার মতে এইরূপ অনুদার জাতীয়তাবাদই ইয়োরোপের রাজনীতিক অধঃপতনের মূল কারণ। অন্যটিতে প্রক শ পাইল ইয়োরোপের কর্ম্মমুখর ও সংগ্রামশীল জীবনের প্রতি উত্তরোত্তর আসক্তি।

এই সময়েই আর একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। ইকবাল ফারসী ভাষাতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। উর্দ্দু ভাষার প্রতি প্রচুর মমতা থাকা সত্ত্বেও কেন ফারসী ভাষাকে তিনি নূতন করিয়া বরণ করিলেন তাহা বুঝিয়া উঠা

কঠিন নহে। বয়স হিসাবে উর্দ্দু ফারসী ভাষার কাছে শিশুর মত। শব্দ ও ভাব সম্পদে, ছন্দের বৈচিত্র্যে ও পরিপূর্ণতায় ফারসী ভাষার সঙ্গে উর্দ্দুর তুলনাই হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন উর্দ্দু হিন্দুস্থানের ভাষা, বৃহত্তর পৃথিবীর কাছে ফারসী ভাষার তুলনায় তাহার প্রতিষ্ঠা নাই। ইকবাল নিজেই এই বিষয়ে কৈফিয়ৎ দিয়া গিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে পেয়ালার দোষগুণ বিচার না করিয়া রসিকজন যেন মদিরার রসের বিচার করেন।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইকবাল দর্শন ও অর্থনীতিতে উচ্চ ডিগ্রি লাভ করিলেন। এইখানে ব্রাউন, নিকল্‌সন প্রমুখ খ্যাতনামা অধ্যাপকদের সহিত তাঁহার পরিচয় ও সৌহার্দ্দ্য হয়। ইহার পর তিনি জার্ম্মানীর মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পারস্যের দর্শন সম্বন্ধে মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন। পরে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ব্যারিষ্টার হন। ইহা ছাড়া তিনি 'লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্‌স্ এণ্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স'-এ যোগদান করেন এবং অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করেন। সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়মাসকাল তিনি অস্থায়ীভাবে আরবী ভাষার অধ্যাপকের কাজ করেন। এই সময়ে তিনি ইসলাম সম্বন্ধে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। প্রথম বক্তৃতাটি হইয়াছিল 'ক্যাক্‌স্‌টন্ হল'-এ এবং সমস্ত বড়

বড় সংবাদপত্রেই তাহা ছাপা হইয়াছিল। এই বক্তৃতার ফলে পণ্ডিত সমাজে ইকবালের খ্যাতি বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়ে।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ইকবাল লাহোরে ফিরিয়া আসেন এবং সরকারী কলেজে ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা স্থরু করেন। এই সঙ্গে আইন ব্যবসায় করিতেও অনুমতি মিলিল। কিন্তু বেশী দিন ইকবাল দুই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেন না। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপনা কার্য্যে ইস্তফা দিয়া তিনি পুরাপুরি ভাবে ব্যারিষ্টারীতে লাগিয়া গেলেন।

এই সময়ে ইকবালের কাব্যে একটি নূতন স্থর ধ্বনিত হইতে লাগিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিখ্যাত দার্শনিক কবিতার বই 'আসরাব-ই-খুদী' (আত্মতত্ত্ব বা Secrets of the Self) প্রকাশিত হয়। বইখানি ফারসী ভাষায় লেখা। 'আসরাব-ই-খুদী'তে ইকবাল হাফিজের কাব্যাদর্শকে গুরুতরভাবে আক্রমণ করেন এবং সাহিত্যে সজীবতা, পৌরুষশক্তি ও গতিশীলতার প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। ফলে হাফিজের মতাবলম্বী সমালোচকদের সহিত তাঁহার বিচারযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। যাহা হউক, এই বইখানার মধ্য দিয়া ইকবালের কবিখ্যাতি বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিকল্সন 'আসরাব-ই-খুদী'র ইংরাজী অনুবাদ করিয়া আমেরিকা ও ইয়োরোপের সহিত কবি ইকবালের পরিচয় ঘনিষ্ঠ করিয়া তোলেন। 'আসরাব-ই-খুদী'র পর দ্বিতীয় প্রধান বই বাহির হয় 'রামুজ-ই-বেখুদী'। ইহাও

ফারসী ভাষাতে রচিত। এই সময়ে ইকবাল উর্দ্দু কবিতায় রামায়ণ রচনা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইয়া উঠে নাই।

'আসরার-ই-খুদী' ও 'রামুজ-ই-বেখুদী' ইকবালের নূতন ভাবধারার বলিষ্ঠ বাহন হইলেও কাব্যের পরিপূর্ণতার দিক দিয়া ইহাদিগকে ইকবালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলা যায় না। ইংরাজ কবি কোল্‌রিজ বলিয়াছেন যে কেহই বড় দার্শনিক না হইয়া বড় কবি হইতে পারেন না। দার্শনিক ইকবালের বাণী সর্ব্বপ্রথম 'আসরার-ই-খুদী' ও 'রামুজ-ই-বেখুদী'—এই দুইখানি পুস্তকের মধ্য দিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই কারণেই সমালোচকগণ ইকবালের সমগ্র কাব্যকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া বিচার করেন। 'রামুজ-ই-বেখুদী' প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইকবালের কাব্যসাধনার প্রথম পর্ব্ব শেষ হইয়া গেল—নবযুগের সূচনা হইল।

১৯২১ সালে 'খিজির-ই-রাহ্' এবং ১৯২২ সালে 'তুলু-ই-ইস্‌লাম' নামে দুইটি উর্দ্দু কবিতার মধ্য দিয়া নূতন ভাব ও আদর্শ যথাযথ রূপ গ্রহণ করিল। ১৯২৪ সালে 'বাঙ্-ই-দারা' নামক কবিতা-সঞ্চয়ন গ্রন্থে ইকবালের অন্যান্য উর্দ্দু কবিতার সহিত এই কবিতা দুইটিও প্রকাশিত হইয়াছে। 'বাঙ্-ই-দারা' শুধু ইকবালের কাব্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নহে, উর্দ্দু কাব্য-জগতের অন্যতম নক্ষত্র।

'বায়াম-ই-মাশরিক' (প্রাচ্যের বাণী) ইকবালের ফারসী

কবিতা সংগ্রহ গ্রন্থ। ফারসী ভাষায় ইকবালের যে কতখানি পাণ্ডিত্য ও অধিকার ছিল তাহার নিদর্শন এই কবিতাগুলি হইতে পাওয়া যায়। ইহার দুই বৎসর পর প্রকাশিত হয় ইকবালের অন্যতম ফারসী গ্রন্থ 'জবুর-ই-আজম্' (প্রাচ্য-গাথা) জীবনের রহস্যময় দিকের ও সর্ব্বপ্রেরণার উৎসমূলের ইঙ্গিতগুলি এই গ্রন্থের কবিতাবলীর মধ্যে চমৎকার ফুটিয়াছে।

ফারসী ভাষাতে ইকবালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'জাবীদ-নামা'। গুণগ্রাহী সমালোচকগণ 'জাবীদ-নামা'কে 'শাহ্‌নামা' প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত কাব্যগুলির সহিত একশ্রেণীভুক্ত করিয়া বিচার করিয়াছেন। প্রকাশোন্মুখ জীবনের যে ধারা অন্তরের দিকে বহিয়া চলিয়াছে তাহার গতি, ভঙ্গি ও সুর আশ্চর্য্য শিল্প-প্রতিভায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে ইকবালের 'জাবীদ-নামা' গ্রন্থে। চিন্তার দুর্ব্বলতা, ভাবের সঙ্কীর্ণতা, ভাষার জটিলতা এই কাব্যধারাকে কখনও মলিন, মন্থর ও আবিল করে নাই।

'জাবীদ-নামা'র পর ইকবাল আবার উর্দ্দু কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। 'বাল-ই-জিব্রেইল' এবং 'জারব-ই-কলীম' নামে দুইখানি কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হয়। অবশ্য ফারসী কবিতা রচনা তিনি বন্ধ করিয়া দেন নাই। 'মুসাফির' নামে ফারসী কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে। ইহা ছাড়া আরও দুই এক খানা ফারসী ও উর্দ্দু কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উর্দ্দু ও ফারসী কবিতা একত্র করিয়া ইকবালের

শেষ সংগ্রহ-পুস্তক বাহির হয় তাঁহার মৃত্যুর পর। এই পুস্তকের নাম 'অরমুঘান-ই-হিজাজ'।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে ইকবাল 'স্যার' উপাধি লাভ করিলেন। এই দুর্লভ রাজকীয় সম্মান প্রাপ্তি সম্বন্ধে চমৎকার একটি গল্প আছে। ইয়োরোপের একটি বিশিষ্ট পরিদর্শক আসিয়া লাহোরে লাটপ্রাসাদে কিছুদিন ছিলেন। মধ্য এশিয়া পরিভ্রমণ কালে তিনি কবি ইকবালের কথা শুনিয়াছিলেন, তাঁহার কবিতাও পড়িয়াছিলেন। লাহোরে আসিয়া লাটসাহেবের মারফৎ ইকবালের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া তিনি অত্যন্ত প্রীত হন এবং এমন একজন গুণী ব্যক্তিকে রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করা হয় নাই বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন। পর বৎসরই ইকবাল উক্ত উপাধি লাভ করিলেন।

সদালাপে ও মিষ্টভাষণে ইকবালের খ্যাতি ছিল অসাধারণ। তাঁহার সহিত আলাপ করিতে গিয়া কোন স্তরের কোন ব্যক্তিই কদাচ অসন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া আসেন নাই। একই বৈঠকে বসিয়া বিবিধ বিষয়ে ইকবাল অনায়াসে বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়া যাইতেন। আইনষ্টাইনের বৈজ্ঞানিক মতবাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতেই আধুনিক যুযুৎসু কিংবা সঙ্গীত সম্বন্ধে কথা কহিতে তাঁহার অসুবিধা হইত না, শ্রোতৃ-বর্গও তাঁহার কথা বুঝিতে কোন অসুবিধা বোধ করিত না। জ্ঞানের গভীরত্ব ও হৃদয়ের বিস্তৃতি দ্বারা তিনি বিষয় ও পাত্রের ব্যবধান অনায়াসে দূর করিতে পারিতেন। শুধু মৌখিক

আলাপেই নহে, পত্রালাপেও তিনি অত্যন্ত ভদ্র ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও সর্ব্বদাই পত্র লিখিয়া যথাকালে সকলেই তাঁহার উত্তর পাইত। একেবারে অতি সাধারণ লোক হইতে শুরু করিয়া মুসোলিনী, নাদির শাহ প্রমুখ ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার পত্রালাপ ছিল।

ব্যক্তিগত জীবনেই হউক, আর রাজনৈতিক বা সাহিত্যিক জীবনেই হউক, স্বমতে অক্ষুণ্ণ নিষ্ঠা রাখিয়াও যে বিরোধী মতাবলম্বীর সহিত বন্ধুত্ব রাখা যায়, ইকবাল তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বস্তুতঃ নম্রস্বভাব ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার দ্বারাই তিনি মানুষের চিত্ত জয় করিতেন। সাহিত্যিক মতবাদের দিক হইতে প্রাচীনপন্থী উর্দ্দু কবি জিরামী তাঁহার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব এক মৃত্যু ছাড়া আর কিছুতেই ছিন্ন করিতে পারে নাই।

ভারতবর্ষে ইকবাল খুব অধিক স্থানে পরিভ্রমণ করিবার অবসর পান নাই। কর্ম্মকেন্দ্র ছাড়িয়া অন্যত্র বিশ্রাম গ্রহণ করিবার জন্যও যাইতে তাঁহার ইচ্ছা হইত না। ১৯২৮ সালে তিনি দক্ষিণাপথ পরিভ্রমণে বাহির হন এবং মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ ও আলিগড়ে 'ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় চিন্তাধারার পুনর্গঠন' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। পরে অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস হইতে পুস্তিকাকারে বক্তৃতাগুলি বাহির হয়।

১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিবার জন্য ইকবাল বিলাতে গমন করেন। এই উপলক্ষে আর একবার

ইয়োরোপে ও ইসলামের সংস্কৃতিভূমিতে আংশিক পরিক্রমা শেষ হয়। এইবার তিনি ফরাসী দার্শনিক হেনরী বের্গসোঁর সহিত দেখা করেন। প্রত্যাবর্ত্তন পথে তিনি স্পেনে মূর সভ্যতার নিদর্শনগুলি দর্শন করিয়া আসেন। জেরুজালেমে তিনি ইসলামীয় সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতে পর্য্যটন করিতে পারেন নাই।

ইকবালের স্বাস্থ্য মোটামুটি খারাপ ছিল না, কিন্তু জীবনের শেষের দিকে তাহা একেবারেই নষ্ট হইয়া পড়িল। ১৯২৪ সালে প্রথমতঃ মূত্রাশয়ে গোলমাল আরম্ভ হয়। চিকিৎসার জন্য ইকবাল ভিয়েনা যাইবেন স্থির হইয়াছিল। কিন্তু বন্ধুদের পরামর্শে অন্ধ চিকিৎসক হাকিম আবদুল ওয়াহাব আন্সারীর চিকিৎসাধীনে থাকিয়া তিনি আরোগ্য লাভ করেন। ইহার দশ বৎসর পর তাঁহার গলনালীতে অসুখ হওয়ায় একেবারে স্বরভঙ্গ হইয়া যায়। চিকিৎসকগণ বলিলেন, গলার মধ্যস্থ স্নায়ুমণ্ডলীতে পক্ষাঘাত হইয়াছে। দুরারোগ্য রোগ। দিল্লী, লাহোর ও ভূপালে থাকিয়া যথাসাধ্য চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। এই সময়ে, ১৯৩৫ সালে, অক্‌স্‌ফোর্ডে বক্তৃতা দিবার জন্য ইকবালের নিমন্ত্রণ আসিল, কিন্তু তাহা স্বাস্থ্যের জন্য তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন না। দুই বৎসর পর চক্ষুরোগ হইল। ইকবাল একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন।

দেহ যত দুর্ব্বল ও অশক্ত হইয়া পড়িল ততই যেন চিন্তা ও মননশক্তি প্রখর হইয়া উঠিতে লাগিল। ঔষধ সেবন চিন্তা

ও চেতনাকে স্তিমিত করে বলিয়া ইকবাল উহা ব্যবহার করিতে চাহিতেন না। রোগশয্যায় শুইয়া শেষ দিন পর্য্যন্ত পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে তিনি অব্যাহত আগ্রহ দেখাইয়া গিয়াছেন, সানন্দে নিজের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। জীবনে যে সমস্ত কার্য্য করিতে চাহিয়াছিলেন অথচ নানা কারণে করিতে পারেন নাই, সেগুলির প্রতি একটু সকরুণ মমতা ও ব্যর্থতার বেদনা ইকবালকে এই সময়ে আকুল করিয়া তুলিত। জীবনের প্রায় শেষদিন পর্য্যন্ত ইকবাল কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বেও তাঁহাকে কবিতা আবৃত্তি করিতে শোনা গিয়াছে।

১৯৩৮ সালের ২১শে এপ্রিল ইকবালের মৃত্যু হয়। মার্চ্চ মাস হইতেই অবস্থা খারাপ যাইতেছিল, কিন্তু তবু এত শীঘ্র যে তিনি সকলকে ছাড়িয়া যাইবেন তাহা কেহ ভাবিতে পারে নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন তাঁহার ছাত্রজীবনের এক জার্ম্মান বন্ধুর সহিত ইকবাল অনেকক্ষণ আলাপ করিয়াছিলেন। শেষ সময় পর্য্যন্ত মৃত্যুর যন্ত্রণা বা ভয় তাঁহাকে কাতর করে নাই, গভীর প্রশান্তির মৃদু হাসিরেখা মৃত্যুর পরও তাঁহার মুখে লাগিয়া ছিল। সেদিন অপরাহ্ণে লক্ষ লক্ষ লোকের শোকাশ্রু-পাতের সঙ্গে লাহোরের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শাহী মসজিদের পাশে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

ইকবাল শুধু বড় কবি ছিলেন না, বাস্তব জীবনে বড় হইতে হইলে মানুষকে যে সব গুণের সাধনা করিতে হয় সবগুলিই

তাঁহার অধিকারে ছিল। কাজেই কবি ইকবালের পরিচয়ের সঙ্গে শিক্ষাব্রতী ইকবালের, আইনজীবী ইকবালের, রাজনীতিজ্ঞ ইকবালের, দেশপ্রেমিক ও ইসলাম-ভক্ত ইকবালের পরিচয় জানিতে হয়। সব মিশাইয়া যে রূপটি ফুটিয়া উঠে তাহাই যথার্থ ইকবাল।

ইকবাল নিজে কৃতী ছাত্র ছিলেন। সব কৃতী ছাত্রই ভাল শিক্ষক হয় না এবং সব শিক্ষকই শিক্ষাব্রতী নহেন। কিন্তু ইকবালের চরিত্রে এই তিন আদর্শের সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তিনি জীবন সুরু করিয়াছিলেন শিক্ষকরূপে,—স্বদেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্রই তিনি শিক্ষকের সম্মান ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। বৃত্তি হিসাবে শিক্ষকতা কার্য্য ত্যাগ করিয়াও শিক্ষা বিষয়ে ইকবাল একটুও শিথিলপ্রযত্ন হন নাই। পাঞ্জাবের শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে তাঁহার দীর্ঘদিন যোগাযোগ ছিল। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমিতির সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের 'ডীন' (Dean) রূপে এবং দর্শন বিভাগের সভাপতিরূপে বহু বৎসর তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করিয়াছেন। লাহোরের ইসলামিয়া কলেজের সঙ্গেও কয়েক বৎসর তাঁহার নিবিড় যোগ ছিল। বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে গিয়া শিক্ষাসম্পর্কিত বিভিন্ন সমিতিতে তিনি কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আফগান সরকার তাঁহাকে আফগানিস্থান পরিদর্শন করিয়া শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে আমন্ত্রণ করেন। তাঁহার সুপারিশ মত

কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ও আফগান সরকারের শিক্ষাবিভাগের বহু পরিবর্ত্তন করা হয়। দিল্লীর জামিয়া-মিল্লিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া আইন ব্যবসায়কে ইকবাল একমাত্র বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আইন ব্যবসায় ভারতবর্ষে অর্থোপার্জ্জনের একটি চমৎকার পন্থা। কৃতী আইনজ্ঞ ও আইন ব্যবসায়ী হইলে ধনী হইতে বেগ পাইতে হয় না। ইকবাল আইন ব্যবসায় করিয়া ধনী হইতে পারেন নাই বলিয়া আইনে তাঁহার পারদর্শিতা সম্বন্ধে মনে স্বতঃই প্রশ্ন উদিত হয়। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের সংবাদ রাখেন তাঁহারা জানেন যে ইকবাল কখনও ধনী হইবার চেষ্টা করেন নাই, যে পরিমাণ অর্থোপার্জ্জন করিলে জীবন স্বচ্ছল ভাবে কাটিয়া যাইতে পারে তাহার অধিক আয় করিবার চেষ্টা তাঁহার ছিল না। আইন ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতে হইলে সমাজসেবা, রাজনীতি, সাহিত্য—অর্থাৎ জীবনের অন্যান্য দিকগুলি—বাদ দিয়া একান্তভাবে আইনসেবা করিতে হয়। ইকবালের পক্ষে তেমন ভাবে আইন ব্যবসায় চালান অসম্ভব ছিল। এই জন্যই তিনি অধিক সংখ্যক মামলা গ্রহণ করিতেন না। তাহা ছাড়া, আইন সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি সর্ব্বদাই নৈতিক বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইতেন। যে মামলাতে তিনি বুঝিতেন যে মক্কেলের কোন উপকার করিতে পারিবেন না সে মামলা তিনি গ্রহণ করিতেন না। শুধু তাহাই নহে, যে মামলা তিনি গ্রহণ

করিতেন হাজার কাজের মধ্যেও কখনও সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র ভুল বা ত্রুটি করিতেন না। একটি ঘটনা হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। একদা এক মক্কেল ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া ইকবালকে বলিলেন যে তাঁহার মামলার বিচার আরম্ভ হইয়াছে। ইকবাল অবাক হইয়া আদালতে গেলেন এবং বিচারককে জানাইলেন যে মামলাটির তারিখ ভুল হইয়াছে বলিয়া তাঁহার ধারণা। জজ নথিপত্র তলব করিয়া দেখিলেন ইকবালের ধারণাই ঠিক, আদালতের আমলার ভ্রমক্রমেই মামলাটি সেদিন উঠিয়াছিল।

দেশের রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন পর্য্যায়ের সঙ্গে ইকবালের যোগাযোগ মৃত্যু অবধি অক্ষুণ্ণ ছিল। শুধু লেখায় ও কথায় নহে, প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনৈতিক কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিয়া তিনি মুসলমান সমাজের স্বার্থরক্ষা ও সেবা করিয়া গিয়াছেন। লাহোরের 'আঞ্জুমান-ই-হেমায়েত-ইসলাম' (ইসলাম সংরক্ষণ সমিতি) নামক প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি গোড়া হইতেই যুক্ত ছিলেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পাঞ্জাব আইন সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। সাইমন কমিশন আসিবার পর ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কমিশন সমক্ষে সাক্ষ্য দান করেন। সেই বৎসরই তিনি মুসলিম লীগের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ১৯৩১-৩২ সালে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে তিনি লণ্ডনে গিয়াছিলেন এবং নানা কমিটিতে থাকিয়া শাসনতন্ত্র রচনা ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পৃথিবীর সম্মুখে ইকবালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করিতেছে তাঁহার অমর কাব্যগুলি। ইকবাল কবি—ভারতের কবি। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "জগতে আজ ভারতের স্থান অতি সঙ্কীর্ণ। এই সময়ে ইকবালের মত একজন কবিকে হারানো খুবই কষ্টের কথা ; কারণ ইকবালের কবিতার একটা বিশ্বজনীন মূল্য ছিল।" এই বিশ্বজনীন মূল্য ইকবালকে বিশ্বের দরবারে উচ্চ আসন দান করিয়াছে। কাজেই ইকবালকে বুঝিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম তাঁহার কবিতার ও কাব্যসাধনার মর্ম্মবাণী বুঝিতে হইবে ; বুঝিতে হইবে—কবি হিসাবে ইকবাল কেন শ্রেষ্ঠ—কোন গুণে তাঁহার কাব্যগুলি মহীয়ান হইয়াছে।

পূর্ব্বে ইকবালের কাব্যগুলির মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এইবার তাঁহার কবিতার মূল সুর সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে। সকল কবিই কবিতা রচনার প্রেরণা নিজের মনের মধ্য হইতে লাভ করিয়া থাকেন। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং কামনা-বাসনার স্বাতন্ত্র্য লইয়া মানুষের মন সর্ব্বদাই আন্দোলিত হইতেছে। কিন্তু কবি-প্রতিভার মধ্য দিয়াই এই আন্দোলন যথার্থভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারে। শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনায় বক্তিগত জীবনের আশা-আকাজ্ক্ষাগুলি সার্ব্বজনীন—বিশ্বজনীন রূপ পাইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে আবেদনের এই ব্যাপকতা ও বিস্তৃতিই হইতেছে কবিখ্যাতির শ্রেষ্ঠ পরিমাপক। ইহা দ্বারাই কবি স্থান-কালের সীমা অতিক্রম করিতে পারেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও আদর্শ সকলের একপ্রকার

নহে। কাজেই কাব্যাদর্শে ও শিল্পসৃষ্টিতে কবিদের মধ্যে বিভিন্নতা এবং কখনও কখনও বিরোধিতা দেখা যায়। তাই প্রত্যেক কবির নিজস্ব বিশিষ্টতা থাকে।

ইকবালের কবিতার মধ্যে যে সার্ব্বজনীন আবেদন ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার প্রধান কারণ দুইটি। তাঁহার দৃঢ় বাস্তব বুদ্ধি লইয়া ইকবাল ভরসা করিতেন যে মানুষ সমস্ত সঙ্কীর্ণতা ও তুচ্ছতা অতিক্রম করিয়া একদা পরম উন্নতি লাভ করিবে; এ উন্নতির কোথাও শেষ সীমা নাই, কারণ, নিখিল বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে মানুষের আসন সকলের উপরে। মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই দ্বিধাহীন বিশ্বাস তাঁহার কাব্যজীবন গঠন করিয়াছে। অদৃষ্টবাদের উপর একান্ত নির্ভরতা—এবং জীবনে দুঃখ-কষ্ট, জরা-মৃত্যুর অনিবার্য্য আক্রমণের জন্য চরম নৈরাশ্য ও বৈরাগ্য—এই দুইটি প্রাচীন মতবাদই ইকবাল পরিহার করিয়াছেন। কর্ম্মের উপর, গতির উপর তিনি অগাধ আস্থা রাখিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে দুঃখ-কষ্ট-জরা-মৃত্যু সব লইয়াই মানুষ পূর্ণতার দিকে ছুটিয়াছে।

তাই ইকবাল বৈরাগ্যের কবি নহেন, কঠোর জীবন-সংগ্রামের কবি। জীবনকে তিনি দেখাইয়াছেন সংঘর্ষের পটভূমিকায়। এই সংগ্রামের অবসান যখন হইবে, ইকবালের পরিকল্পিত মহামানব ('মুমিন') যখন জয়লাভ করিবে জীবনযুদ্ধে, তখন পৃথিবীতে ভেদ-বৈষম্য থাকিবে না—নূতন জগতের পত্তন হইবে। অন্যায় ও অপূর্ণতার ক্ষোভ দূরীভূত

হইবে—মানুষ মানুষের সহিত ভালবাসায় আবদ্ধ হইয়া সুখে শান্তিতে বাস করিবে।

এই সার্ব্বজনীন আদর্শের মধ্যে ইকবাল তাঁহার জন্মভূমিকে ভুলিয়া যান নাই। উর্দ্দু কবিতাগুলির মধ্যে তাঁহার স্বদেশ-প্রেমের কবিতাগুলি চিরজীবী হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার রচিত 'হিমালা' নামক কবিতাটির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কবিতায় হিমালয়কে তিনি হিন্দুস্থানের মহান্ রক্ষক রূপে অঙ্কন করিয়াছেন। সব চেয়ে বিখ্যাত হইতেছে 'তারানা-এ-হিন্দ্' (ভারত সঙ্গীত) কবিতাটি।

"সারে জহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হমারা
হম্ বুলবুলে হায় উসকী, উহ্ গুলেস্তাঁ হমারা।"
'সারা দুনিয়ার মাঝে সেরা আমাদের হিন্দুস্থান
আমরা তার বুলবুল সে আমাদের গুলস্তান॥'

এই গীতটি না জানে এমন লোক আজ হিন্দুস্থানে বিরল। কিন্তু শুধু একটি নহে; এমন বহু গীত ইকবাল রচনা করিয়া গিয়াছেন। 'হিন্দুস্থানী বাচ্চু কাঁ কওমী গীত' (হিন্দুস্থানের ছেলেমেয়েদের জাতীয় সঙ্গীত)—একটি অপূর্ব্ব স্বদেশ-ভক্তিমূলক সঙ্গীত।

"চিশ্‌তী যাহার মাটির উপরে সত্যের বাণী শুনাইল।
নানক যাহার বাগিচায় বসি একতার গীত উঠাইল॥
তাতারীরা যারে পরম আদরে স্বদেশ আপন করে নিল।
আরব হইতে হেজাজীরা যেথা পলকে ছুটিয়া আসিল
সেইতো আমার জন্মভূমি, সেইতো আমার পুণ্যদেশ॥"